Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

তিন গোয়েন্দা

গোপন ফর্মূলা

রকিব হাসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হারানো এক মূল্যবান দলিল
খুঁজতে চলল তিন গোয়েন্দা,
সঙ্গী হলো দুর্ধর্ষ বেদুইন ওমর শরীফ।
ক্যারিবিয়ানের হাজারও দ্বীপের মধ্যে থেকে
খুঁজে বের করতে হবে ওটা।
আগেই গিয়ে বসে আছে ওখানে
পুরানো শত্রু জেনারেল জন ডুগান।
হাত মিলিয়েছে পটাশিয়াম সায়ানাইডের
চেয়ে বিষাক্ত ফ্রিক সায়ানাইডের সঙ্গে।
মারাত্মক বিষধর কার-ডি-ল্যাঙ্কের ভয় দেখাল সে।
আকাশ ছেয়ে দিল লাল ফ্ল্যামিঙ্গোর ঝাঁক।
ষোলোকলা পূর্ণ হলো এবার।
দলিল খোঁজা তো দূরের কথা,
প্রাণ বাঁচানোই দায়!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

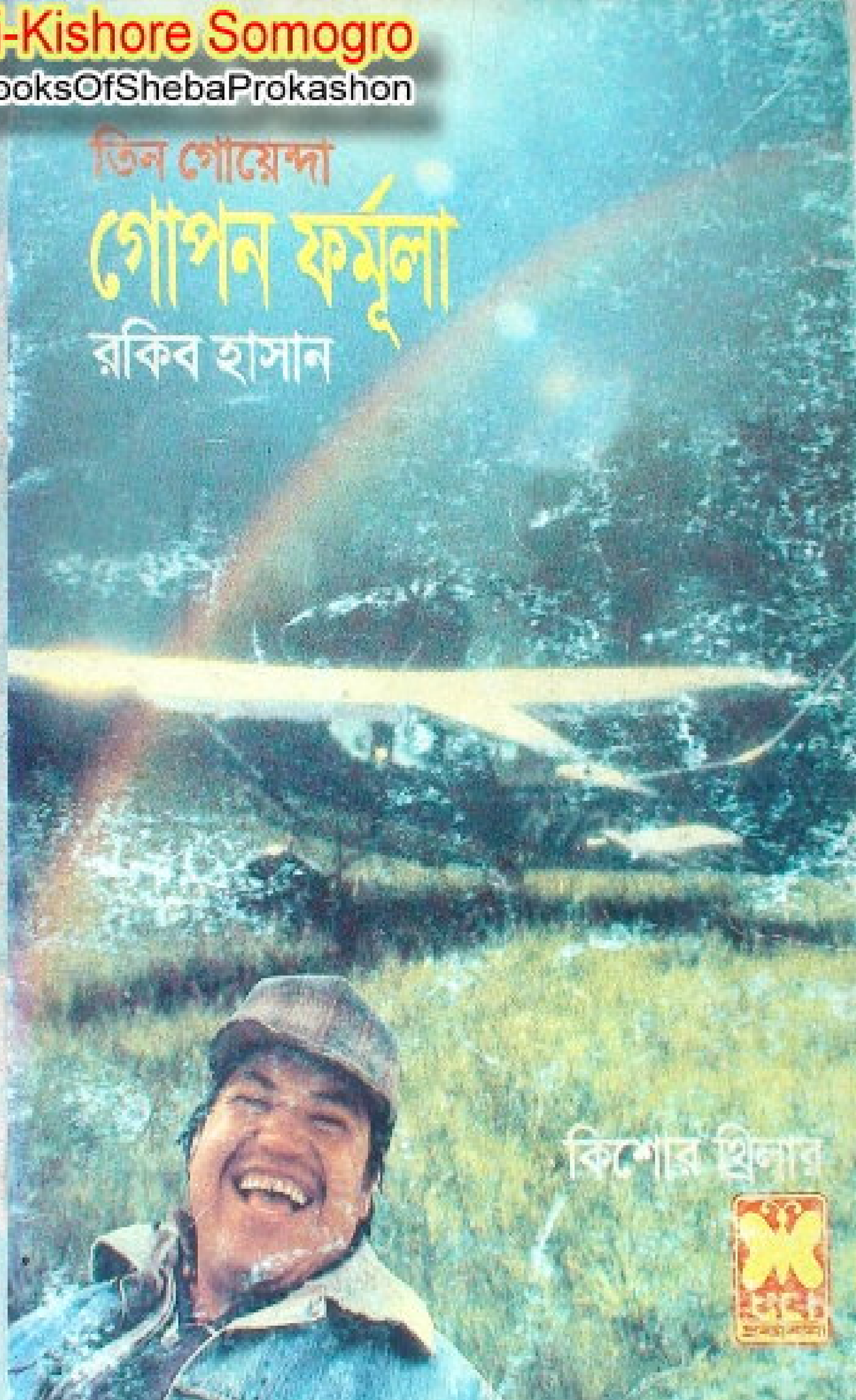

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

গোপন ফর্মূলা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

'আমাকে দেখা করতে বলছেন, স্যার?'

মুখ তুলে তাকালেন লস অ্যাঞ্জেলেসের পুলিশ-চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। 'এসেছ। বসো।'

'বাড়ি ফিরতেই চাচী বলল, আপনি জরুরী খবর দিয়েছেন,' চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল কিশোর। 'দেরি করিনি আর।'

সামনের ফাইলগুলো দুহাতে ঠেলে সরিয়ে ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন ক্যাপ্টেন। 'খবরটা শুনলে চমকে যাবে।'

সামনে ঝুঁকে বসল কিশোর। অপেক্ষা করছে।

'খাবে কিছু?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না। খেয়েই দৌড় দিয়েছি।'

একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগালেন ক্যাপ্টেন। খস করে কাঠি জ্বেলে আগুন ধরালেন। 'তোমাদের বন্ধু জেনারেল উইলার্ড ব্রন ডুগান এখন জ্যামাইকায়,' কথাটা যেন ছুঁড়ে দিলেন ধোঁয়ার সঙ্গে।

ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। 'খোঁজ তাহলে পাওয়া গেল!'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন।

'ডুগান ওখানে কি করছে জানেন কিছু?'

'কি করছে জানি না। তবে কেন গেছে অনুমান করতে পারছি।'

কয়েকবার জোরে জোরে টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটটা রেখে দিলেন ক্যাপ্টেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে দুই হাতের আঙুলের মাথা সব এক করে দেখলেন একবার। তারপর তাকালেন কিশোরের দিকে। 'অদ্ভুত এক গল্প। কিছু কিছু জায়গায় ফাঁক আছে, অনুমানে ভরাট করতে হয়েছে সেগুলো। যাই হোক, হেস হফনার নামে কারও কথা কখনও বলেছে ডুগান?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না।'

'বলার কথাও নয়। নামটা গোপনই রেখেছে। তা ছাড়া ডুগানের সোনা লুটের কেসের সঙ্গে হেসের কোন সম্পর্ক ছিল না। লোকটা জার্মান। ডুগানের তরুণ বয়েসে ওর সঙ্গে পরিচয়। ধান্দাবাজ লোক। যুদ্ধের সময় জার্মান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে ছিল। হিটলার যখন ক্ষমতায়, তখন বড় বড় অস্ত্র তৈরির কোম্পানি আর নেভির সঙ্গে লিয়াজোঁ অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছিল সে। যুদ্ধের পর যুদ্ধাপরাধী হিসেবে ধরা পড়ল না, স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল। হিটলার যে হারতে যাচ্ছে, বোধহয় আগে থেকেই আঁচ করে ফেলেছিল। পালানোর পথ

আগেভাগেই তৈরি করে রেখেছিল, যাতে হিটলারের পতনের সঙ্গে গায়েব হয়ে যেতে পারে। মজাটা হলো, পালিয়ে শত্রুর রাজ্য আমেরিকাতেই চলে এসেছিল সে। ডুগান তাকে লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল।'

'তারমানে এখন আপনারা জেনে ফেলেছেন, ও কোথায় আছে?'

শুকনো-হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ। যুদ্ধ কি আজকে শেষ হয়েছে! এতটা কাল জনৈক নরউইজন নাগরিক গানো ক্রাগেনের ছদ্মবেশে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিল জ্যামাইকার কিংসটনে, অথচ কেউ কিছু বুঝতে পারল না। ব্রিটিশ, আমেরিকান, এমনকি তার নিজের দেশের সিক্রেট সার্ভিসও আন্দাজ করতে পারেনি সে কোথায় লুকিয়ে আছে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'দারুণ লোক তো! পারল কি করে?'

'ভীষণ চালাক, সে তো বুঝতেই পারছ। "রোগ" নামে এক এঞ্জিনের ছোট একটা ইয়টে করে একা আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে চলে গেছে কিংসটনে।'

'অ্যাডভেঞ্চারের লোভে ওসব আজকাল হরদম করে লোকে। এঞ্জিন ছাড়া শুধু পালের নৌকাতে করেও মহাসাগর পাড়ি দেয়। শুনতে আর অবাক লাগে না এখন।'

'দেয়, তবে হেসের ব্যাপারটা অন্য রকম। নিঃসঙ্গ নাবিকের ভান করে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিতে চেয়েছে সে। যাই হোক, কাগজপত্র সব ঠিক ছিল বলে ওকে সন্দেহ করেনি কেউ। নির্বিবাদে বাস করতে লাগল হেস। তাকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি আর কর্তৃপক্ষ। ঘামানোর কি দরকার? চাকরির জন্যে ধরনা দেয়নি কারও কাছে, নিজের টাকায় চলছিল। বেআইনী কিছু করেনি। সরকারও তাকে অহেতুক খোঁচাখুঁচি করেনি। টিউ'স অ্যাঙ্কারেজ নামে পুরানো একটা বাড়ি কিনে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে নাম দিল ক্রাগেন'স নেস্ট। শোনা যায়, কুখ্যাত জলদস্যু টিউর বাড়ি ছিল টিউ'স অ্যাঙ্কারেজ।'

'বাহ্, চমৎকার! জলদস্যুর বাড়িতে ঠাঁই নিল এক স্থলদস্যু। ওঅর ক্রিমিন্যাল, তারমানে বহু মানুষের খুনের জন্যে দায়ী। বাড়িটার নাম ক্রাগেন'স নেস্ট না দিয়ে কল্পিত জলদানব ক্রাকেনের নামে ক্রাকেন'স নেস্ট দিলে আরও ভাল করত, মানাত ঠিকমত।...কিন্তু কথা হলো, যুদ্ধের পর পর তো জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের ব্যাপারে কড়া নজর ছিল মিত্রবাহিনীর। কিংসটনে কেউ ওকে চিনতে পারল না কেন?'

'বললাম না, খুব সতর্ক ছিল হেস। সাগর পাড়ি দেয়ার সময় বড় বড় দাড়িগোঁফ গজিয়ে গিয়েছিল ওর, কাটেনি আর সেগুলো। তার ওপর ইয়াবড় এক সানগ্লাস পরেছিল। উদ্দেশ্য ছিল দুটো—রোদ থেকে চোখ বাঁচানো, চেহারাটাও যতটা সম্ভব ঢেকে রাখা। নরউইজন নাবিকের পোশাক পরা, রোদে পোড়া তামাটে চামড়া দেখে নিঃসঙ্গ নাবিকটি যে হিটলারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল, কল্পনাই করতে পারেনি কেউ। মোট কথা, একা ওই সাগর পাড়ি দেয়ার বুদ্ধিটাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল ওকে।'

'ওর জাহাজ সার্চ করেনি বন্দর কর্তৃপক্ষ?'

'করেছে।'

'নিশ্চয় টাকাপয়সা, সোনাদানা অনেক নিয়ে গিয়েছিল সে। নইলে বাড়ি কিনল কি দিয়ে? ওর ইয়ট সার্চ করে সেগুলো পায়নি ওরা?'

শ্রাগ করলেন ক্যাপ্টেন। 'ছিল না ওর সঙ্গে। বন্দরে নামার আগে নিশ্চয় অন্য কোনখানে লুকিয়ে রেখে এসেছিল। কোথাও না থেমে সরাসরি জ্যামাইকাতেই গিয়েছিল, এরকম কোন প্রমাণ নেই।'

'ওর জ্যামাইকাবাসের খবরটা জানা গেল কি করে শেষ পর্যন্ত?'

'হেস হফনার, ওরফে গানো ক্রাগেন মারা যাওয়াতে। স্বাভাবিক মৃত্যু। বুড়ো হয়ে মারা গেছে।'

'পরিচয় ফাঁস হলো কি করে?'

'যত চালাকই হোক, কিছু না কিছু দুর্বলতা সব মানুষেরই থাকে। গানো ক্রাগেনের আলমারিতে হিটলারের সুপারিশ করা একটা চিঠি পাওয়া গেছে, আর হিটলারের সই করা হেস হফনারের একটা ছবি। জিনিসগুলোর প্রতি নিশ্চয় খুব দুর্বলতা ছিল হেসের, হিটলারের হাতের লেখা আর সই বলে মূল্য দিত, হাতে ধরে তাই নষ্ট করতে পারেনি। ওগুলো বাদে, অতীত প্রকাশ করে দিতে পারে এমন কোন জিনিসই রাখেনি সে, সব নষ্ট করে ফেলেছিল।'

'কদ্দিন আগের কথা?'

'পনেরো দিন।'

'ব্রন ডুগান এর মধ্যে ঢুকল কি করে?'

'পত্রিকায় ক্রাগেনের মৃত্যু-সংবাদ দেখেছে হয়তো। কিংবা এখান থেকে তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল জ্যামাইকায়, পুরানো বন্ধু হেসের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার জন্যে। এমন হতে পারে, সে গিয়ে পৌঁছার আগেই মরে গেছে হেস, কবরও দেয়া হয়ে গেছে। যে কারণেই গিয়ে থাকুক ডুগান, সে যে এখন জ্যামাইকায় এ ব্যাপারে আমরা শিওর।'

'মারা গেছে এ খবর জানলে বোধহয় যেত না।'

'মজাটা ওখানেই। মারা গেছে জানলেই আরও বেশি করে যাবে। বিশেষ করে ডুগানের বর্তমান অবস্থায়। পুলিশ পিছে লেগে আছে। পকেটে পয়সা নেই। দুটো কারণে হেসের বাড়িতে যাবে সে—টাকা এবং সেইসঙ্গে লুকিয়ে থাকার সুবিধা। হেসের প্রচুর সম্পদ আছে, সেটা টাকার নোটেই হোক, কিংবা সোনায়ই হোক। সোনা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেগুলো কোনখানে লুকিয়ে রেখেছে সে। নগদ টাকাও ছিল ওর। প্রচুর আমেরিকান ডলার পাওয়া গেছে ওর বাড়িতে।'

'সোনা বেচে পেয়েছে, এ তো বোঝাই যায়। যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, এতদিনে নিশ্চয় আর ফেলে রাখেনি। তুলে এনে এনে বিক্রি করে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। অতএব সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ডুগানের।'

'ডুগান শুধু সোনার পেছনে লাগলে দুশ্চিন্তা করতাম না। আরও জিনিস ছিল হেসের কাছে, যেগুলো আমাদের প্রয়োজন—যুদ্ধের সময়কার জরুরী দলিলপত্র। তা ছাড়া ভয়ঙ্কর একটা জিনিস···ভি এইটিনের নাম শুনেছ?'

এতক্ষণে উত্তেজনা দেখা দিল কিশোরের চেহারায়। 'ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র!

যুদ্ধের শেষ দিকে এর ফর্মূলা তৈরি করেছিল জার্মান বিজ্ঞানীরা। কাজে লাগাতে পারেনি। পারলে মিত্রবাহিনীকে কাবু করতে সাতদিনও লাগত না হিটলারের। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আর কি বোমা ফেলেছে। ভি এইটিনকে উন্নত করতে পারলে মুহূর্তে পৃথিবীটাকেই উড়িয়ে দেয়া যায়…'

'তাহলে বুঝতেই পারছ এই জিনিস খারাপ লোকের হাতে পড়লে কি মহাসর্বনাশ ঘটে যাবে। যুদ্ধের পর পর ওই গবেষণাগারের একজন এঞ্জিনিয়ার ধরা পড়েছিল আমেরিকানদের হাতে। সে বলে দেয়, ফর্মূলাটা জার্মান নেভির কাছে হস্তান্তরের জন্যে খুব গোপনে তুলে দেয়া হয় হেসের কাছে। যুদ্ধের অবস্থা বেগতিক দেখে ওটা নিয়েই পালিয়ে যায় হেস, পরে সুযোগমত নেভিকে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় তার। কিন্তু দেয়া আর হয়নি। তার আগেই পতন ঘটল জার্মানির।'

'হেসের আলমারিতে ছিল না ওটা?'

'থাকলে তো পেয়েই যেতাম। ওর ক্রাকেনের বাসা–তোমার নামটাই ব্যবহার করছি,' হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'তন্নতন্ন করে খুঁজেও ফর্মূলার কোন চিহ্ন মেলেনি। সব কিছু সিল করে দিয়ে গেছে পুলিশ। বাড়ির যে দারোয়ানটা ছিল, তাকে বহাল রাখা হয়েছে। সামান্য দেরিতে খবরটা পেয়েছি আমরা, তাই খবরের কাগজে সংবাদ ছাপানো বন্ধ করতে পারিনি। তবে অন্য কিছু যেন আপাতত না ছাপে, এমব্যাসির মাধ্যমে প্রেসকে অনুরোধ করেছি। গানো ক্রাগেন নামেই কবর দেয়া হয়েছে হেসকে। ওর আসল নামটা ফাঁস হয়নি এখনও। মোটামুটি এই অবস্থায়ই আছে এখন কেসটা।'

'ডুগান যে ওখানেই আছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই তাহলে?'

'না। ও, আরও কিছু তথ্য পাওয়া গেছে, মৃত্যুর আগে কাকে যেন চিঠি লিখছিল হেস। জার্মান ভাষায়। শেষ করতে পারেনি। আনানোর ব্যবস্থা করেছি। ডুগানের আগের কেসটা আমিই ডিল করেছি বলে এবারেও আমাকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। চিঠিটার ইংরেজি অনুবাদ করিয়েছি। তাতে কিছু সূত্র পাওয়া গেছে। চিঠিটা ছাড়া আরও দুটো জিনিস পাওয়া গেছে হেসের ডেস্কে, যেগুলো আমাদের আগ্রহ জাগিয়েছে–ঠিকানা লেখা একটা খাম, আর একটা স্কেচ। নকশা-টকশা হতে পারে। সম্ভবত ওটাও অসমাপ্ত, কারণ মাথামুণ্ড কিছু বোঝা যায়নি। খামে লেখা ঠিকানায় নাম রয়েছে হের উইলফোর ফন ডুগান, হোটেল প্রিন্জ্ কার্ল, জিনদানপ্লাৎজ্, বার্লিন। অতএব ধরে নিতে পারি চিঠিটা ডুগানকেই লিখেছিল হেস।'

'হুঁ। নিজের নামটাকে সামান্য এদিক ওদিক করে জার্মান বানিয়ে প্রিন্জ্ কার্ল হোটেলে উঠেছিল ডুগান। তাই তো?'

'তাই। চিঠি শুরু করেছে "ডিয়ার উইল" দিয়ে। ডুগান যে নাম ভাঁড়িয়ে ওখানে আছে, নিশ্চয় জানত হেস। দাঁড়াও, পড়েই শোনাই।'

ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করলেন ক্যাপ্টেন। তাতে রেখেছেন অনুবাদ করা কাগজটা। খুলে পড়তে শুরু করলেন, 'ডিয়ার উইল, অনেক দিন

পর তোমাকে লিখছি। তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, এখানে যদি কোন গণ্ডগোল হয়ে যায়, তোমাকে একটা বিশেষ জিনিস দেব যেটার সদ্ব্যবহার করতে পারলে লাভবান হবে তুমি। কিসের কথা বলছি আশা করি বুঝতে পারছ। সেই সময় এখন উপস্থিত। ডাক্তার রায় দিয়ে দিয়েছেন, আমার দিন শেষ, যে কোন মুহূর্তে বিদায় নিতে হতে পারে আমার। এবং সেটা ঘটবে অকস্মাৎ। হয়তো এই চিঠিও শেষ করে যেতে পারব না আমি। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে লিখতে বসেছি। যা বলি, মন দিয়ে শোনো। কাগজপত্র, ইত্যাদি সব নিরাপদ জায়গাতেই আছে; আর…'

মুখ তুললেন ক্যাপ্টেন। 'ব্যস, এই। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে লিখতে বসেছিল হেস। চিঠিটা সত্যি সত্যি শেষ করতে পারেনি।'

চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'মানুষের মৃত্যুটা স্বাভাবিক, অথচ ভাবতে গেলে কি অদ্ভুত লাগে!…সূত্র তাহলে এইটুকুই?'

'ডুগান হয়তো আরও কিছু জানে।'

'যে জিনিসটার ইঙ্গিত দিয়েছে হেস, সেটা কি, তা তো নিশ্চয় জানে।'

'ইঙ্গিতটা আমাদের কাছেও পরিষ্কার। আমরাও অনুমান করতে পারছি।'

'স্কেচটার কথা বলুন।'

'যদ্দূর মনে হয়, চিঠিটার সঙ্গেই ওটা পাঠানোর চিন্তা করেছিল হেস। তেমন কিছুই না। একটা রেখাচিত্র, কাছাকাছি একটা বর্গক্ষেত্র আঁকা।'

'আছে নাকি?'

বের করে দিলেন ক্যাপ্টেন।

কাগজটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল কিশোর। দেখে মনে হয় একটা ডিম আঁকতে চেয়েছিল হেস, কিংবা নিচের দিক সরু আপেল। একপাশে দাগ দেয়া। দাগের কাছাকাছি একটা বর্গক্ষেত্র। নিচের ঠোঁটে টান দিয়ে ধরে রেখে নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল, 'নাহ্, সত্যি কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'এত তাড়াতাড়িই নিরাশ করে দিলে? আমার কিন্তু আশা ছিল, আর কেউ না বুঝলেও তুমি এর অর্থ উদ্ধার করে ফেলতে পারবে…'

'পুলিশের বিশেষজ্ঞের চেয়েও আমাকে বুদ্ধিমান ভাবছেন?'

'হ্যাঁ, ভাবছি। এ ধরনের কাজে আমার জানামতে যত বিশেষজ্ঞ আছে–পুলিশেরই হোক, যারই হোক, তার মধ্যে তুমি সেরা। এজন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।'

'ও, শুধু নকশার মানে বের করার জন্যে,' এবার নিরাশ হবার পালা কিশোরের। 'আমি তো ভাবছিলাম, এই সুযোগে জ্যামাইকা ভ্রমণটাও হয়ে যাবে।'

জবাব না দিয়ে পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। গোটা দুই টান দিয়ে গোড়াটা পিষে ফেললেন অ্যাশট্রেতে।

'সোনা আর ফর্মুলাটা আশেপাশের কোন দ্বীপে লুকিয়ে রাখেনি তো হেস?'

কিশোর বলল।

'রাখতে পারে। তবে আমার তা মনে হয় না। কেন হয় না, বলছি। হেসের একটা ইয়ট ছিল, ইয়টে করে বেড়াতেও বেরোত সে। দূর-দুরান্তে চলে যেত। সব সময়ই একা। প্রথমে আমরা ভেবেছি, দ্বীপের স্কেচই এঁকেছে সে। ছোটখাট কোন দ্বীপ, ক্যারিবিয়ানে তো ওগুলোর সীমা-সংখ্যা নেই। জ্যামাইকায় ঢুকেছিল সে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে। ওখানে কি পরিমাণ দ্বীপ আছে জানোই তো।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'উনত্রিশটা বড় দ্বীপ, ছোট দ্বীপ ও উপদ্বীপ মিলিয়ে ছয়শো ষাটটা, আর অতি খুদে দ্বীপ আছে দুই হাজার চারশোর বেশি। ওগুলোর কিছু কিছু আবার ঢেউ আর জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আকৃতি বদলায়।'

'তাহলেই বোঝো।'

'সেজন্যেই বলছি, কোন একটা দ্বীপে জিনিসগুলো লুকিয়ে রেখেছে হেস। বাড়িতে রাখেনি, যে কারও হাত পড়ে যাওয়ার ভয়ে।' স্কেচটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এটা আসলটা?'

'হ্যাঁ।'

'ইনটারেস্টিং!'

'কেন?'

'কাগজটা দেখেছেন, টিস্যু পেপার।'

'তাতে কি?'

'এই কাগজ ব্যবহার করার নিশ্চয় কারণ আছে। লেখার টেবিলে কেউ সাধারণত টিস্যু পেপার রাখে না। কাগজের অভাব হবার কথা নয় হেসের। এই কাগজ নিল কেন?'

'কোন বিশেষ কারণ আছে ভাবছ?'

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

'একটা কারণের কথাই ভাবছি, কোন কিছুর ছাপ নিতে চেয়েছিল হেস। ম্যাপ থেকে হতে পারে। সাধারণ অস্বচ্ছ কাগজে তার কাজ চলছিল না। যেটা ব্যবহার করেছে সেটা পুরোপুরি না হলেও কিছুটা স্বচ্ছ, কাজ চালিয়ে নিয়েছে। তবে এটা একটা সম্ভাবনা। ছাপ নিয়েছেই, সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না। এমনও হতে পারে, হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি হাতের কাছে যে কাগজ পেয়েছে তাতেই ছবিটা এঁকে ফেলেছে হেস।'

'হুঁম্!' ধীরে ধীরে মাথা দোলালেন ক্যাপ্টেন, 'ছাপ দেয়ার ব্যাপারটা ভেবে দেখার মত।'

'আমার ধারণা সত্যি হলে,' উৎসাহ পেয়ে বলতে লাগল কিশোর, 'যে জিনিসের ছাপ নিতে চেয়েছিল সে, সেটা এখনও তার ঘরেই আছে। ডুগান সেটা নিয়ে যাওয়ার আগেই হস্তগত করা দরকার।...আছে কোথায় এখন সে?'

'ম্যাইসন রেসপিরো নামে এক বোর্ডিং হাউসে, জার্মান মদ বিক্রেতার ছদ্মবেশে। রাইন ওয়াইনের গুণগান করে বেড়াচ্ছে।'

'হেসের বাড়িতে ঢোকার অনুমতি পাবে?'

'না।'

'কিন্তু ঢোকার চেষ্টা অবশ্যই করবে।'

'তা তো করবেই। সেজন্যেই তো পাহারাদার রাখা হয়েছে।'

'হেসের মৃত্যুর সময় বাড়িতে কোন চাকর-বাকর ছিল না?'

'ছিল। রান্নাঘরে। দারোয়ান ছিল বাগানে। রাঁধুনি মারগারেট জোয়ালিন নামে এক নিগ্রো মহিলা তার অন্যান্য কাজকর্মও করে দিত, ঘরদোর দেখাশোনা করত। কিন্তু হেসের মৃত্যুর পর আর বাড়ির ধারেকাছেও আসতে চায় না,' হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তার ধারণা, হেস যেভাবে মারা গেছে, তাতে তার আত্মা অতৃপ্ত রয়ে গেছে। আর অতৃপ্ত আত্মারা বাড়ির কাছছাড়া হতে চায় না, যে আসে তারই ঘাড় মটকায়।'

কিশোরও হাসল, 'ধারণাটা একেবারে ভুল নয়। ডুগানের পথে বাধা সৃষ্টি করলে ঘাড়টা ঠিকই মটকে দেবে।...মারগারেট ছাড়া আর কেউ নেই, যে কোন তথ্য দিতে পারে? মানে, অতদিন একটা জায়গায় থাকলে তো বন্ধুবান্ধব জুটে যাওয়ার কথা।'

'মারগারেটকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কারও নাম বলতে পারল না সে। একা বাস করত হেস, নিজের মত থাকত, কারও সঙ্গে খাতির করতে যেত না। তবে রিচার্ড ডেভনশায়ার নামে তার এক পড়শী আছেন। অবসরপ্রাপ্ত নাবিক, যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে যেতেন। তবে দশ-বারোবারের বেশি যাননি। হেস গেছে তাঁর বাড়িতে সাকুল্যে দু'তিনবার। একটা ব্যাপারে দুজনের আগ্রহ ছিল, কথাবার্তা যা হয়েছে শুধু ওটা নিয়েই—নেচারাল হিস্টরি। ওয়েস্ট ইনডিজের পাখির ওপর একটা বই লিখছেন কমান্ডার।'

'ইয়ট নিয়ে কোথায় বেড়াতে যায়, কখনও কিছু বলেনি তাঁকে হেস?'

'না। এখানেও একটা খটকা আছে। এক নাবিক আরেক নাবিককে সাগরভ্রমণে সঙ্গে নেবে, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু কখনও তাঁকে যেতে বলেনি হেস। এটা নাকি অবাক লেগেছে কমান্ডারের।'

'হেসের আসল নামও জানতেন না?'

'না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে থেকে কিশোর বলল, 'হেসের সাহসের তারিফ করতে হয়। জার্মান যুদ্ধাপরাধী হয়ে গিয়ে ব্রিটিশদের মাঝে ঠাঁই।'

'লুকিয়ে থাকতে হলে শত্রুর বাড়িতেই নিরাপদ—এই প্রবাদটা সত্যি প্রমাণ করেছে আরকি হেস।'

'তো, ডুগানের ব্যাপারে কি করবেন ভাবছেন?'

'আপাতত ওকে পাকড়াও না করে ওর ওপর নজর রাখার কথা ভাবছি। ওকে বুঝতেই দেব না যে ওকে আমরা সন্দেহ করছি। তাহলে পথ দেখিয়ে ফর্মূলাটার কাছে নিয়ে যাবে আমাদের।'

'বলা যায় না, শেষ মুহূর্তে পুলিশের নাকের ডগা থেকে মাল নিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত পিচ্ছিল লোক।'

'উঁহুঁ, সেটি পারবে না। পুলিশের অজান্তে বেরোতেই পারবে না দ্বীপ থেকে।'

'আপনি যাই বলুন, স্যার, ডুগানের ব্যাপারে এই বাজিটা ধরতে পারছি না আমি। আমেরিকা থেকেই এত এত পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গায়েব হয়ে গেল। আর এখন তো রয়েছে বহুদূরে, আমেরিকান পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে, সম্পূর্ণ আরেক দেশে।'

'জ্যামাইকাতেও পুলিশ আছে। আমরা কিছু করতে অনুরোধ করলে ফেলবে না। বিশেষ করে একজন যুদ্ধাপরাধীর যেখানে তদন্ত হচ্ছে। তা ছাড়া মারণাস্ত্রের ফর্মূলা উদ্ধারের ব্যাপারটাও ফেলনা নয়, সারা পৃথিবীর স্বার্থ এতে জড়িত।'

'তা অবশ্য ঠিক।' সামান্য উসখুস করে বলল কিশোর, 'তাহলে এখন আমি যাই। যার জন্যে ডেকে এনেছেন, নকশাটার তো কিছু করতে পারলাম না···এটুকু দেখে অবশ্য কিছু করাও যাবে না। এর মর্ম উদ্ধার করতে হলে সরেজমিনে তদন্ত করা দরকার।'

হাত তুললেন ক্যাপ্টেন, 'বসো। একটু আগে বলছিলে না, জ্যামাইকা ভ্রমণটা হয়ে যাবে। সেই সুযোগটা যদি পাও?'

চোখের পাতা সরু হয়ে এল কিশোরের, 'তারমানে আমাকে যেতে বলছেন ওখানে?'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। 'শুধু তুমি একা নও, মুসা আর রবিনকেও নিতে পারো ইচ্ছে করলে। বিদেশ-বিভুঁই, সহকারী এবং বন্ধু থাকলে সুবিধে। আরও একজন লোক বিশেষ উপকারে আসবে তোমাদের, সঙ্গে নিলে বিরাট সাহায্য পাবে তার কাছ থেকে—ওমর শরীফ। আমার বিশ্বাস, ফর্মূলাটা খুঁজে বের করতে হলে আশেপাশের দ্বীপগুলোতে ঘোরাফেরা করতেই হবে তোমাদের। তার জন্যে দরকার একটা ব্যক্তিগত প্লেন, সেটা নিজেদেরই হোক, কিংবা ভাড়া। আর যে কোন ধরনের প্লেন চালানোর জন্যে ওমরের চেয়ে দক্ষ পাইলট কোথায় পাবে?'

একটা মুহূর্ত চুপ করে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে হাসি ফুটল মুখে। 'তারমানে ওখানে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েই আমাকে খবর দিয়েছিলেন?'

মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন, 'শুরুতেই বলেছি, জটিল নকশার মর্ম উদ্ধার করার জন্যে তোমার চেয়ে যোগ্য লোক আর আমার জানামতে কেউ নেই। তা ছাড়া ডুগানের সঙ্গে একটা ফাইট ইতিমধ্যেই দিয়ে ফেলেছ তোমরা। আরও একটা নাহয় দিলে। আমেরিকান পুলিশের ছাপ্পর মারা কোন এজেন্টকে পাঠালে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাকে চিনে ফেলবে ডুগান, সতর্ক হয়ে যাবে। তোমাদের ব্যাপারে সেটা হবে না। যদিও দেখলে অবাক হবে, তোমরা জ্যামাইকায় কেন? তবে ভেবে নেবে ব্যাপারটা কাকতালীয়. তোমরা স্রেফ বেড়াতে গেছ ওখানে।

অতএব বুঝতেই পারছ, আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে তোমাদের জ্যামাইকা ভ্রমণের খরচ জোগানোর যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।'

দুই

সাতদিন পর।

জ্যামাইকার কিংসটন। সকাল শেষ। দুপুর শুরু হব হব করছে।

ওমরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর। অবাক হয়ে দেখছে পামগাছ, সবুজ লন, আর টকটকে লাল ডেক চেয়ারে ঘেরা সীল সুইমিং পুল। একপাশে দাঁড়িয়ে বাজনার চর্চা করছে ঝলমলে রঙের পোশাক পরা ব্যান্ডবাদকরা। গরমের ট্যুরিস্ট সীজন শুরু হতে দেরি আছে। কিন্তু এখনই পৌঁছে গেছে বেশ কিছু ট্যুরিস্ট। সাগরের ধারে কেউ সূর্যস্নান করছে, কেউ সাঁতার কাটছে, কেউ বা টেবিল ঘিরে বসে কফি খাচ্ছে।

মুসা আর রবিন নেই ওদের সঙ্গে। কলাম্বাস বে'তে অতি পুরানো মডেলের একটা টুইন এঞ্জিন উভচর অটার বিমান পাহারা দেয়ার জন্যে রয়ে গেছে ওরা। কাছেই প্রায় চোখে পড়ে না এমন একটা হোটেলও পেয়ে গেছে। ওদের ওখানে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে ওমরের সঙ্গে কিংসটন শহরে এসেছে পুলিশ চীফের সঙ্গে দেখা করে ওদের পরিচয় জানাতে। ওরা আসছে, ফোন করে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। একটা চিঠিও দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে, চীফকে দেখানোর জন্যে, যাতে কোন রকম অসুবিধে না হয় ওদের।

জানা গেল, ব্রন ডুগান ওই শহরেই আছে। সারাদিন প্রায় কিছুই করে না। কখনও গোসল করে, কখনও সুইমিং পুলের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের কাছের বাগানে বসে অলস সময় কাটায়। কিশোরের মনে হলো, জেনারেলের উপস্থিতিটাকে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না পুলিশ।

হেসের বাড়ির প্রহরা ঠিকই আছে। চাবি আছে দারোয়ানের কাছে। ঘরের কোন জিনিস নড়ানো হয়নি। বন্দরের যেখানে নোঙর করা ছিল হেসের ইয়ট 'রোগ', সেখানেই আছে।

হেসের ঘর আর আলমারির চাবিগুলো চাইল ওমর। চীফ বললেন ওগুলো দারোয়ানের কাছে আছে। তিনি খবর পাঠাচ্ছেন, ওরা গিয়ে চাইলেই যাতে দিয়ে দেয়। অন্যের কাঁধে দায়িত্বটা তুলে দিতে পেরে যেন বেঁচে গেলেন চীফ। বোঝা গেল, এত 'সাধারণ' ব্যাপার নিয়ে রোজ রোজ মাথা ঘামাতে তাঁরা নারাজ। ভঙ্গিটা এমন, ডুগান যদি কিছু করে থাকে সেটা আমেরিকায় করেছে, কিংসটনে তো আর করেনি, সুতরাং জ্যামাইকান পুলিশের কি? তাতে খুশিই হলো কিশোর। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। সারাক্ষণ পুলিশ কাঁধের কাছে হুমড়ি খেয়ে থাকলে অসুবিধেই হত। সব কাজের কৈফিয়ত দিতে হত। ব্যাখ্যা করতে হত।

এখন ওঁদের প্রথম কাজ, হেসের বাড়িতে ঢুকে ভালমত সার্চ করা।

জরুরী কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখা। কিশোরের দৃঢ় বিশ্বাস, কোন ম্যাপ, চার্ট, ফটোগ্রাফ কিংবা ড্রয়িং থেকে যদি স্কেচটা করা হয়ে থাকে, সেটা ওই বাড়িতেই কোথাও আছে। না পাওয়া গেলেই পড়বে বেকায়দায়। আশপাশের সাগরে ডিম্বাকৃতি কিংবা আপেলের মত দেখতে কোন দ্বীপ আছে কিনা বের করার চেষ্টা চালাতে হবে তখন বিমান নিয়ে। উড়ে উড়ে আকাশ থেকে দেখতে হবে, নইলে আকৃতি বোঝা যাবে না। সাংঘাতিক কঠিন, কিংবা বলা যায় প্রায় অসম্ভব একটা কাজকে সম্ভব করতে হবে এভাবে।

আপাতত, ডুগানকে দিনের এই সময়টায় যেখানে দেখা যায়, সেই জায়গাটা ঘুরে দেখতে এসেছে দুজনে। এরপরে যাবে হেসের বাড়িতে।

জরুরী কাজ ফেলে বাগানে বসে বসে সময় কাটায় ডুগান, অবিশ্বাস্য মনে হলো ওদের দুজনেরই। অদ্ভুত। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ওভাবে অলস সময় কাটানোর লোকই নয় জেনারেল। উদ্দেশ্যটা কি ওর? কিসের অপেক্ষা করছে? এভাবে সময় কাটালে কোন্ সুবিধেটা হবে?

এমন হতে পারে, তাড়াহুড়ার প্রয়োজন মনে করছে না ডুগান। হেসের বাড়ি থেকে দারোয়ান বিদেয় হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারপর বাড়িটা হয় কিনে নেবে, নয়তো ভাড়া নিয়ে বাস করতে থাকবে ওখানে। কারও সন্দেহ না জাগিয়ে পুরো বাড়িটা খুঁজে দেখতে কোন অসুবিধে হবে না তখন আর তার।

– কেন বসে বসে সময় কাটাচ্ছে? জবাব ওই একটাই। তবু খুঁতখুঁতে ভাবটা কিছুতেই গেল না কিশোরের। 'ওই যে, বসে আছে। পুলের কিনারে, লম্বা চেয়ারটায়, বাথরোব পরা। বড় বড় দাড়ি।'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখে ফেলল ওমর। 'আলখেল্লা দিয়ে শরীর ঢেকে ওভাবে সানবাথ্ হয় নাকি? থাকুক বসে। যা ইচ্ছে করুক। চলো, আমাদের কাজ সেরে ফেলি।'

গাড়িতে ফিরে এল দুজনে। দশ মিনিট চালিয়েই পৌঁছে গেল হেসের বাড়িতে।

রাস্তার পাশে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল ওমর। 'লুকানোর জন্যে রীতিমত একটা জঙ্গল বেছে নিয়েছিল হেস। সৈকতটা দেখো!'

'জলদস্যুর বাড়ি, সৈকত তো সুন্দর হবেই। টিউ কি আর সাধারণ দস্যু ছিল।...কিন্তু আমি দেখছি রঙের বাহার! আহ্, কি রঙ!'

আকাশ এতই নীল, দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। সেই রঙের ছায়া ফেলে সাগরটাকেও করে তুলেছে একই রকম নীল। তার কিনারে বাঁকা চাঁদের মত ঝকঝকে রূপালী সৈকত। প্রবালের একটা বেদি যেন মাথা তুলে রেখেছে পানির ওপর। তাতে আছড়ে পড়ে হীরকের ফোয়ারা ছিটাচ্ছে নীলচে-সাদা ঢেউ। হিসহিস শব্দ তুলে সরে আসছে, প্রবালের বেদি ঘিরে রেখে আসছে তুষারশুভ্র ফেনার মালা। সৈকতের কিনারে এত বেশি নারকেল গাছ জন্মেছে, গাছের জঙ্গল মনে হয়। ওগুলোকে জড়িয়ে রেখেছে বাসনের মত বড় বড় পাতাওয়ালা আঙুরলতা। বাড়ির পেছনে বেশ খাড়া হয়ে উঠে গেছে ভূমি। তাতেও বিশাল ফার্ন ঘন জঙ্গল তৈরি করে রেখেছে। তার মধ্যে আবার

বুগেনভিলা, জেসমিন আর হিবিসকাস ফুলের ছড়াছড়ি। বাতাসে পোকামাকড় আর মৌমাছির একটানা গুঞ্জন নেশা ধরায়। কান পেতে শুনতে গেলে আপনা থেকে বুজে আসে চোখ।

'স্বপ্নের জগৎ, তাই না?' নেশাটা ধরেই গেল যেন ওমরের। বিড়বিড় করে বলল, 'বাস্তব মনে হয় না।' গাড়ি থেকে গেটের দিকে এগোল সে। গাছপালার জন্যে বাড়িটা চোখে পড়ছে না। তবে গেট যেহেতু আছে, বাড়িও আছে নিশ্চয়।

ঠিকানা দেখে বোঝা গেল ভুল বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছিল সে। এই এলাকায় মাত্র দুটো বাড়িই আছে। তারমানে এটা হেসের পড়শী রিচার্ড ডেভনশায়ারের।

একশো গজ দূরে রঙচটা, প্রায় ধসে পড়া একটা গেটের পাশে অস্পষ্ট হয়ে আসা অক্ষরে নেমপ্লেট দেখা গেল:

ক্রাগেন'স নেস্ট

গেটের ভেতরে ঢুকে শ্যাওলায় ঢাকা একটা রাস্তা ধরে গাড়ি চালাল ওমর। আম আর কলাগাছের জঙ্গল হয়ে আছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা রাঙাআলুর গাছ যেন যুদ্ধ করছে আগাছার জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। গাছপালায় ঘেরা বাড়িটা চোখে পড়ল অবশেষে। বহু পুরানো ওটা, জানা আছে ওদের, তবে এতটা পুরানো ভাবতে পারেনি। বেশির ভাগ জানালার খড়খড়ি নামানো। পোকামাকড়ের ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

এত নীরবতার মাঝে মানুষ থাকে কি করে ভাবতে অবাক লাগল কিশোরের। চারপাশে তাকিয়ে দারোয়ানকে খুঁজতে শুরু করল। কোথাও দেখা গেল না ওকে।

গাড়ি থেকে নেমে এগোল দুজনে। সামনের দরজার পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে। ঠেলে সেটা খুলে ফেলল ওমর। ভেতরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে গেল।

হলঘরেই আছে দারোয়ান। ওদের স্বাগত জানাতে কিংবা কেন ঢুকেছে জিজ্ঞেস করতে উঠে এল না। আর্মচেয়ারে লম্বা হয়ে পড়ে আছে। মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে অচেতন। স্থানীয় লোক। বাদামী চামড়া। আঙুলের ফাঁক থেকে কার্পেটে খসে পড়েছে জ্বলন্ত সিগারেট। নীল ধোঁয়ার একটা সরু রেখা পাক খেয়ে খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

দারোয়ানের দায়িত্ব পালনের নমুনা দেখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ওমর। মুচকি হেসে লোকটার কাঁধ ধরে ঠেলা দিল।

নড়ল না দারোয়ান।

আরও জোরে ঝাঁকি দিল ওমর।

তাতেও সাড়া দিল না লোকটা।

ওমরের মুখের হাসি হাসি ভাবটা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। ভ্রূকুটি করে দারোয়ানের এক চোখের পাতা তুলে ধরে কালো মণিটা দেখল। শক্ত হয়ে গেল চোয়ালের পেশি। নিচু হয়ে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। খোলা দরজা দিয়ে ওটা ছুঁড়ে ফেলে ঠোঁটে আঙুল রেখে কিশোরকে সাবধান করল যাতে কথা না বলে হল থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটার দিকে

তাকাল।

কি সন্দেহ করেছে ওমর, বুঝে ফেলল কিশোর।

তিনটে দরজা আছে ঘরে। দুটো দুই পাশে, তৃতীয়টা বেশ দূরে, পেছন দিকে। তিনটেই বন্ধ। তবে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খুট করে একটা শব্দ কানে এল, ডানের সবচেয়ে কাছের দরজাটার ওপাশ থেকে। পা টিপে টিপে সেটার দিকে এগিয়ে গেল ওমর। হাঁটু মুড়ে বসে কী-হোল দিয়ে অন্যপাশটা দেখল। ফিরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে কিশোরকে বুঝিয়ে দিল কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কারণ তালার ফুটোয় চাবিটা ঢুকিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

তখনও একইভাবে নাক ডাকাচ্ছে দারোয়ান।

চীনামাটির তৈরি পুরানো আমলের ডোর-নবটা চেপে ধরল ওমর। খুব সাবধানে মোচড় দিল। আস্তে করে খুলে গেল পাল্লাটা। একটু শব্দও হলো না। তবু বোধহয় চোখের কোণ দিয়ে নড়াচড়া দেখে কিংবা বাতাস লাগাতে ঘুরে তাকাল লোকটা। ডেস্কে ঝুঁকে কি যেন দেখছিল। মুখোমুখি হলো দুজনে।

পুরো পাঁচটা সেকেন্ড একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনেরই কথা আটকে গেছে যেন।

কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে। বিশ মিনিট আগে যাকে দেখে এসেছে সুইমিং পুলের ধারে, সেই লোক আলখেল্লা ফেলে দিয়ে শার্ট-প্যান্ট পরে চলে এসেছে ওদের আগে আগে, কি করে সম্ভব হলো সেটা? সামনে দাঁড়ানো লোকটা যে জেনারেল ব্রন ডুগান তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেল ধীরে ধীরে।

আগে কথা বলল ওমর, 'এভাবে চোরের মত অন্যের ঘরে ঢুকে পড়বেন, এটা আশা করিনি, জেনারেল।'

'ভুল করছেন আপনি, ওমর,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ডুগান, 'একটা বিশেষ কাজে এসেছি আমি এখানে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' শীতল কণ্ঠে বলল ওমর। 'তা সেই বিশেষ কাজটা কি, জানতে পারি কি? কি খুঁজতে এসেছেন?'

'খুঁজতে এসেছি কে বলল আপনাকে? ব্যবসা করতে এসেছি। রাইন ওয়াইনের এজেন্সি নিয়েছি আমি, জানেন না বোধহয়। বিক্রি করার জন্যে বাড়ি বাড়ি ঘুরছি।' দরজার ঠিক পাশেই রাখা একটা ব্যাগ দেখাল ডুগান। 'চেখে দেখবেন নাকি? দেব বের করে?'

'লাগবে না। ওসব পচা জিনিস গিলে লিভার নষ্ট করার কোন আগ্রহ আমার নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তা ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যে বাড়ির চাকর-দারোয়ানদের নেশার জিনিস দিয়ে ঘুষ পাড়ানো লাগে নাকি?'

শ্রাগ করল ডুগান। 'মিস্টার হেস···মানে ক্রাগেনের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। ভদ্রতা করে দারোয়ানটাকে একটা সিগারেট খেতে দিয়েছিলাম। কি করে জানব, কড়া জিনিস সইতে পারে না সে?'

'যে জিনিস দিয়েছেন সেটা আপনিও সইতে পারবেন না।'

'বাড়ির মালিককে তো পেলাম না,' ওমরের কথাকে যেন পাত্তাই দিল না ডুগান। 'থাক, পরেই আসব।' এগিয়ে এসে নিচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিল। 'একটা কথা বলি, আমাকে দেখে আপনি যেমন অবাক হয়েছেন, হঠাৎ করে আপনাকে এখানে ঢুকতে দেখে আমিও হয়েছি। চলি।'

অবাক হয়ে দেখছে কিশোর, বাধা দেয়ার কোন চেষ্টা করছে না ওমর। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঘুরল ডুগান। তার স্বভাবসুলভ নির্মল হাসি হেসে বলল, 'কাকতালীয় হলেও, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় ভালই হলো, মিস্টার ওমর। নইলে জানতেই পারতাম না আপনারাও এখানে চলে এসেছেন। রাইন ওয়াইনের ব্যাপারে আপনার ধারণার পরিবর্তন হলে দয়া করে জানাবেন আমাকে।'

'তারমানে কিছুদিন থাকছেন এখানে?'

'বলা মুশকিল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল ডুগান। 'সেটা নির্ভর করবে আমার ব্যবসা কতখানি ভাল চলে তার ওপর।··· ব্যবসাটা অবশ্যই মদের, অন্য কিছু ভেবে বসবেন না আবার।'

'কেন, আরও কোন ব্যবসা করছেন নাকি?'

এবারের প্রশ্নটাও যেন শুনতে পেল না, এরকম ভঙ্গিতে ওমরের কাঁধের ওপর দিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল ডুগান। আবার নজর ফেরাল ওমরের দিকে। 'আপনারা বোধহয় থাকছেন কিছুদিন?'

'সত্যি কথাটাই বলি, জেনারেল,' চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে বলল ওমর, 'থাকব তো বটেই। বলা যায় না, এ বাড়িতেও থেকে যেতে পারি।'

'এ বাড়িতে?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আমিও এখানে থাকার কথা ভাবছিলাম। বাড়িটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। যাকগে, হলেই যে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। সাবধান থাকবেন, মিস্টার ওমর, বাগানে কিন্তু সাপ আছে।'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে। 'সাপকে ভয় পাই না আমি। ওসব শয়তান প্রাণীগুলোকে কি করে সামাল দিতে হয়, জানা আছে আমার।'

'সবচেয়ে বড় সাপুড়েও অনেক সময় সাপের কামড়েই মারা যায়, মিস্টার ওমর। চলি। গুড-বাই।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে গেল ডুগান।

'যেতে দিলেন?' ওমরের পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'আর কি করতে পারতাম? এমন কোন অপরাধ করেনি যে আটকাব। খুব খারাপ হয়ে গেল।'

'কি?'

'আমাদের এ বাড়িতে ঢুকতে দেখে ফেলাটা। অন্য কোথাও দেখলে হয়তো সন্দেহ করত না, কিন্তু একেবারে হেসের বাড়িতে···ঠিকই বুঝে যাবে ও, জ্যামাইকায় কিজন্যে এসেছি আমরা। সাবধান হয়ে যাবে। পিছে লাগবে এখন জানা কথা। শান্তিতে আর কাজ করতে দেবে না।'

'বিনা অনুমতিতে বাড়িতে ঢোকার অপরাধে ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেয়া যায়।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কোন লাভ হবে না। যে জিনিসটা নিতে এসেছিল সে, যদি নিয়ে গিয়ে থাকে, আদায় করতে পারব না।'

'আমার মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি ওটা নিতে পেরেছে সে। সময়ই পায়নি। দারোয়ানকে দেয়া সিগারেটটাও পুড়ে শেষ হয়নি। তারমানে বড়জোর এক কি দুই মিনিট ছিল হেসের ঘরে। তা ছাড়া জিনিসটা হাতে পেয়ে গেলে একটা মুহূর্তও আর এ দ্বীপে দেরি করত না সে। পালাত!'

'হ্যাঁ। পুলিশকে বলেও আসলে কোন লাভ নেই। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই ওর বিরুদ্ধে আমাদের। চুরি করে ঢোকেনি, দারোয়ানই সাক্ষি দেবে। দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে ঢুকেছে, তাকে সিগারেট অফার করেছে। দারোয়ান সেটা নিজের ইচ্ছেয় নিয়েছে–সিগারেটে কি ছিল না ছিল সেটা কোন ব্যাপার না। ওতে যে মাদকদ্রব্য ছিল স্রেফ অস্বীকার করবে ডুগান। দোষটা পড়বে গিয়ে তখন দোকানদারের ঘাড়ে, যেখান থেকে সিগারেট কিনেছে সে। তার চেয়ে ছাড়া থাকাই ভাল। আমাদের দেখে ফেলে একদিকে যেমন ভাল হয়েছে, আরেক দিকে খারাপও হয়েছে। একটা উদ্বেগের মধ্যে পড়ে যাবে। শান্তিতে কাজ উদ্ধার করার আশা তার শেষ।'

'তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না, এত তাড়াতাড়ি, আমাদের আগেই এসে হাজির হলো কি করে সে?'

'হতবাক তো হয়ে গিয়েছিলাম আমিও সেজন্যেই।'

'এর একটাই জবাব হতে পারে, সুইমিং পুলে যাকে দেখেছি আমরা, সে ডুগান নয়।'

'কি বলো!'

'হ্যাঁ, তাই। এর আর কোন ব্যাখ্যা নেই। ওই লোক ডুগান হয়ে থাকলে আমাদের আগে কোনমতেই গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।'

'কিন্তু দুজন লোকের অবিকল এক চেহারা, অতিরিক্ত কাকতালীয় হয়ে গেল না ব্যাপারটা?'

'কাকতালীয় কিছু নেই এর মধ্যে।'

'মানে?'

'কাউকে ব্রন ডুগান সাজিয়ে ডুগান নিজেই বসিয়ে দিয়ে এসেছে। ওর চালাকিটা সফল হয়েছে। পুলিশ, আমরা–যারাই চোখ রেখেছি, সবাইকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছে। রোজই এই কাজ করে সে। অতিরিক্ত সাবধানতা। সে ধরেই নিয়েছিল, কেউ নজর রাখতে পারে তার ওপর। না রাখে তো ভাল, কিন্তু যদি রাখে, তাহলে যাতে ধোঁকায় পড়ে। ফাঁকতালে সে তার নিজের কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে।'

'ওর চেহারার কাউকে পেয়ে যাবে এই দ্বীপে, এটাও বিশ্বাস করা কঠিন।'

'সেটা করছিও না আমি। নিজের চেহারার সাথে মোটামুটি মেলে এমন

একজনকে খুঁজে বের করে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। আর যে পোশাকে সাজিয়েছে, তাতে অতটা মিল না থাকলেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব। দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা, বিরাট চশমা, আলখেল্লা পরা···জানা না থাকলে আলাদা করে চেনাটা কঠিনই। আর,' নাকের ডগা চুলকাল কিশোর, 'একজন যদি আনতে পারে, বেশিও আনা যায়। হয়তো দু'তিনজন সহকারী নিয়ে এসেছে সে।'

'হুঁ, তা পারে। ভয় দেখানোর সাহসটা পেল বোধহয় সেজন্যেই। সাপের ভয় দেখানোটা তো স্পষ্ট হুমকি।'

'সে তো বোঝাই গেল।'

'জ্যামাইকায় বিষাক্ত সাপ আছে নাকি?'

'কেন, ভয় পাচ্ছেন?' হাসল কিশোর। 'ঠিক জানি না। তবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে ফার-ডি-ল্যান্স নামে মারাত্মক বিষাক্ত সাপ আছে।'

'বিষাক্ত সাপকে ভয় না পাওয়াটাই বোকামি। সেটা ফার-ডি-ল্যান্সই হোক, আর ডুগানই হোক। ভয় পেলে সাবধান থাকে মানুষ, আর সাবধান থাকলে বিপদ এড়ানো সহজ হয়।' ভুরু নাচাল ওমর, 'কি করবে এখন? ম্যাপ খুঁজবে?'

'সেটা পরে করলেও চলবে। আগে চলুন, সুইমিং-পুলের নকল ডুগানের সঙ্গে গিয়ে দেখাটা সেরে আসি। ডুগানের হুমকিকে কতটা কেয়ার করতে হবে, ওই লোকটার সঙ্গে কথা বললেই বোঝা যাবে।'

'তা মন্দ বলোনি। চলো।'

হলঘরে বেরিয়ে দেখল, হাই তুলছে দারোয়ান। আড়মোড়া ভাঙল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। ঘোর কাটেনি এখনও। ওমর আর কিশোরকে দেখে জড়ানো স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনারা?'

'তোমার বস্ যাদের কাছে চাবি দিতে বলেছেন,' কিছুটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিল ওমর। 'দাও। দিয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমাওগে, যাও।'

'ঘুমাতে যাব?'

'তো আর কি করবে? পাহারা দেয়ার নমুনা তো দেখলাম। দাও, চাবি দাও।'

চাবির গোছাটা দিয়ে টলমল পায়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিল ওমর। কিশোরকে নিয়ে গাড়িতে চড়ল। রওনা হলো সুইমিং পুলে।

রাস্তায় কড়া নজর রাখল কিশোর, ডুগানকে দেখা যায় কিনা। গেল না। সাগরতীরের পথটা ধরে গেছে হয়তো সে।

সুইমিং পুলের কাছে এসে গাড়ি পার্ক করে নামল দুজনে। সেই একই জায়গায় একই ভঙ্গিতে বসে আছে ডুগানের নকল। গায়ে বাথরোব জড়ানো। পত্রিকা পড়ছে।

'ব্যাপারটাই তো সন্দেহ জাগানোর মত,' ওমর বলল। 'এখন লাঞ্চের সময়। এ সময় পত্রিকা পড়ে নাকি কেউ? ওই পোশাকে বসে!'

সুইমিং পুলের দিকে এগোল সে আর কিশোর।

কাছাকাছি এসে দেখা গেল, ডুগানের চেহারার সঙ্গে ভালই মিল আছে

লোকটার। উচ্চতা একই রকম। তবে ওজন কিছুটা বেশি। সেটা কাছে থেকে ভাল করে না তাকালে ধরা যায় না। যারা চেনে দূর থেকে দেখলে তাদেরও ডুগান বলে ভুল করাটা স্বাভাবিক।

নড়াচড়া লক্ষ করেই বোধহয় মুখ তুলে তাকাল লোকটা। চোখাচোখি হয়ে গেল কিশোরের সঙ্গে। একধরনের অদ্ভুত শীতল চাহনি। অক্টোপাসের চোখের মত। ভয় ধরায়।

'অন্ধকার রাতে ওর সঙ্গে কোন কানাগলিতে ঢুকতে সাহস পাব না আমি,' ওমর বলল, 'কখন পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়!'

দাঁড়াল না ওরা। এগিয়ে গেল কিছুটা সামনে। সাদা পোশাক পরা একজন বুড়ো ওয়েইটার টেবিল মুছছে। খেয়ে উঠে গেছে কয়েকজন লোক। সেটাতে বসল দুজনে। বুড়ো আঙুল কাত করে নকল ডুগানকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'ওই ভদ্রলোকের নাম জানো?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ওয়েইটার, 'না, স্যার। দু'একবার ড্রিংক দিয়েছি, কথা তেমন হয়নি। বিদেশী। বিচিত্র কয়েকজন দোস্ত আছে। ওই যে, আসছে একজন।'

'বিচিত্র' দোস্তটা নকল ডুগানের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় কিছু বলল। সামান্য মাথা নোয়াল নকল ডুগান। দ্বিতীয় লোকটার গায়ের রঙ কালচে-বাদামী, নিগ্রোদের মত পুরো কালো নয়। চেহারায় আহামরি কিছু নেই। বেশ লম্বা। কিশোরের দৃষ্টি যে জিনিসটা আকর্ষণ করল, সেটা ওর পোশাক। কড়া ইস্ত্রি করা হালকা নীল রঙের ট্রাউজার–হাঁটুর কাছে প্রচুর ভাঁজ, চৌকো কাঁধওয়ালা কোমরচাপা জ্যাকেট, নিচে অনেক বড় একটা বোতাম। মাথার চওড়া কানাওয়ালা হ্যাটের কানা কপালের ওপর টেনে নামানো। লাল টাইতে ছাপ মারা বড় বড় ফুল, সোনার টাই পিন। বহু পুরানো আমলের পোশাক, পুরানো ডিজাইন। সব মিলিয়ে হাস্যকর। কেবল হাঁটার ভঙ্গি দেখে সেটা মনে হয় না, তাতে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা।

ওয়েইটারের দিকে তাকাল ওমর। 'বিচিত্র শব্দটার ব্যবহার একদম সঠিক হয়েছে। চিড়িয়াটার নাম জানো নাকি?'

'ফ্রিক সায়ানাইড।'

'বাপরে, নামটাও তো বিষাক্ত,' কিশোর বলল, 'পটাশিয়াম সায়ানাইডের জাতভাই হবে হয়তো।'

'একেবারে মিথ্যে বলোনি। ফ্রিকি সায়া বলে ডাকে সবাই,' ওয়েইটার বলল। 'এক ডাকে চেনে। গণ্ডগোল পাকানোর ওস্তাদ। ত্রিনিদাদে ছিল। স্যাগা বয়েজদের নেতা। বহুত খুনখারাবি করেছে। এখানে যে কোন্ শয়তানি করতে এসেছে, ঈশ্বরই জানেন!'

'স্যাগা বয়েজটা কি জিনিস?'

'চোর থেকে শুরু করে গলাকাটা ডাকাত পর্যন্ত যত ধরনের অপরাধী আছে, সবগুলোর মিশ্রণ।'

'ও। তা নেতাজী এখানে কোথায় থাকেন?'

'ডাঙহিলে।'

'বাহ্, জায়গার নামটাও তো বেশ,' না হেসে পারল না কিশোর। 'ডাঙ, মানে গোবর, হিল মানে পাহাড়; অর্থাৎ গোবরের পাহাড়।' কথাটা শুধু ওমর বুঝল, কারণ বাংলায় বলেছে কিশোর, ওয়েইটার বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল।

ভুরু নাচিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল ওমর, 'কোন দিকে ওটা?'

'রেল স্টেশন থেকে একটু দূরে। আপনাদের মত ভাল মানুষদের ওদিকে না যাওয়াই ভাল।...কিছু খাবেন?'

'না,' মাথা নাড়ল ওমর, 'পরে।'

চলে গেল ওয়েইটার।

কয়েকটা পামের নিচে ছায়ার মধ্যে চেয়ার পাতা দেখে এগিয়ে গেল ওমর। কিশোরকে বলল, 'এখানে বসে দেখা যাক কি ঘটে। ভাল চিড়িয়াদের সঙ্গে দোস্তি করেছে দেখা যাচ্ছে ডুগান। আগেরবারও অবশ্য এরচেয়ে ভাল সঙ্গ ছিল না তার। নকলটাকে দেখো, স্লাভ মনে হচ্ছে...চ্যাপ্টা মুখ, উঁচু চিবুক, পূর্ব ইউরোপের লোক।'

একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। মিনিট পনেরো পর এসে হাজির হলো ডুগান। সোজা এগিয়ে গেল আলখেল্লা পরা লোকটার দিকে। বলল কিছু। মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চলে গেল ড্রেসিং কেবিনেটের দিকে। তার জায়গায় বসে পড়ল ডুগান।

'তোমার ধারণাই ঠিক,' ওমর বলল। 'এখানে একা নয় আমাদের বন্ধু ডুগান।' মুখ ফেরাল কিশোরের দিকে। 'দেখা তো হলো। ক্রাগেন'স নেস্টে আবার যাওয়ার আগে লাঞ্চটা সেরে নিই। নাকি?'

ঘাড় কাত করে সায় জানাল কিশোর।

তিন

দুই ঘণ্টা পর আবার ক্রাগেন'স নেস্টে ফিরে এল ওমর আর কিশোর। বড় যে কোনও খালি বাড়ির পরিবেশই বিষণ্ন আর ভারিক্কি হয়, এটার বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হলো না। বরং চারপাশ গাছপালায় ঘিরে থাকা নীরবতায় বিষণ্ণতাটা যেন অনেক বেশি। ঘরগুলো এতটাই নিঃশব্দ, সামান্যতম শব্দকেও বিকট মনে হয়। নিজেদের অজান্তেই কখন থেকে যে পা টিপে টিপে চলাফেরা আর নিচুস্বরে কথা বলা আরম্ভ করেছে ওরা, জানে না।

একবার ঘুরেফিরে দেখে, বাড়ির কোথায় কি আছে মোটামুটি জেনে নিয়ে যে ঘর থেকে ডুগানকে তাড়িয়েছে, সেটাতে ঢুকল ওরা। ঘরটাকে এমন করে সাজানো হয়েছে, যাতে একইসঙ্গে বসার ঘর এবং পড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। জার্মানি থেকে পালিয়ে আসার পর নিশ্চয় জীবনের বেশির ভাগ সময়টাই এঘরে কাটিয়েছে হেস।

যা খুঁজতে এসেছে ওরা, সেটা এবাড়ির কোথাও লুকানো থাকলে বাড়ির মালিকের বিশেষ নির্দেশনা ছাড়া কোনমতেই খুঁজে বের করা যাবে না. বাড়িটাকে টুকরো টুকরো করে খুলে ফেলা হলেও হয়তো গোপনই থেকে যাবে সেই জিনিসটা। কিশোরের একটাই ভরসা–পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করার সময় পায়নি হেস–যেমন অসমাপ্ত চিঠিটা, লিখে শেষ করার আগেই মৃত্যু ঘটেছে তার। তাতে ধরে নেয়া যায়, মূল্যবান সূত্রটা ঠিক জায়গায় লুকানোর সময় পায়নি সে, খোলা অবস্থায়ই পড়ে আছে কোনখানে।

লম্বা, নিচু ছাতওয়ালা কাঠের তৈরি দোতলা বাড়ি। যখন যে-ই বাস করেছে এখানে, একা করেছে। সঙ্গিনী আনেনি। বেশির ভাগ ঘর খালি। আসবাবপত্রও নেই। তাতে বোঝা যায়, কাউকে এখানে আনার ইচ্ছে ছিল না হেসের, এমনকি মেহমানও নয়। তার নিজের বেডরুমটা সুন্দর করে সাজানো। আরেকটা শোবার ঘর আছে, কাজের লোকের জন্যে। নিচতলার দুটো ঘর বেছে নিয়ে একটাকে করা হয়েছে ডাইনিং রুম, অন্যটা স্টাডি। ছোটখাট একটা লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়েছে ওই ঘরে। দুটো ঘরই রুচিসম্মতভাবে সাজানো। আসবাবপত্র সব পুরানো আমলের, খুব ভারী করে মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি। স্টাডি-কাম-সিটিং রুমটায় বিরাট একটা জানালা আছে, বাগানের অনেকখানি চোখে পড়ে সেটা দিয়ে। ঘরের মাঝখানে বড় একটা লেখার টেবিল, তাতে অনেকগুলো ড্রয়ার। বসার চেয়ারটা অনেক বড়, ভীষণ ভারী। কাছাকাছি রাখা হয়েছে ছোট একটা লোহার আলমারি। দেয়ালে কয়েকটা ছবি আছে, আর দুটো বড় ম্যাপ আছে। একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ, আরেকটা ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের–পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোও দেখানো রয়েছে তাতে। টুকিটাকি সংগ্রহ আছে বেশ কিছু। প্রাচীন অলঙ্কার, নাবিকদের ব্যবহারের যন্ত্রপাতি, এ সব। ম্যানটলপীসে রাখা একটা পুরানো আমলের পিতলের ঘড়ি, নানা রকম সামুদ্রিক শামুকের খোলস, আর একটা বড় সাদা ডিম। ঘরের সমস্ত জিনিসের মধ্যে ডিমটাকে খাপছাড়া, বেমানান মনে হলো কিশোরের। গৃহকর্তার রুচির সঙ্গেও যেন মেলে না। সমুদ্রে মাছ ধরার উপযোগী বড় বড় দুটো ছিপ দাঁড় করিয়ে রাখা ঘরের কোণে।

'খোঁজা শুরু করা যাক,' বলে প্রথমেই আলমারিটার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর।

একটা ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করে যা যা পাওয়া গেল, তারমধ্যে একটা জিনিসই সামান্য আগ্রহ জাগাল ওর। আলমারিতে পাওয়া গেছে হিটলারের সই করা একটা ফটোগ্রাফ, অ্যাকাউন্টিঙের ওপর কিছু বই আর কিছু নগদ টাকা। লেখার টেবিলের প্রতিটি ড্রয়ার তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। যা যা আছে, দেখার পর জিনিসগুলো যেমন ছিল আবার তেমন করে রেখে দিয়েছে। আছে খুব কম জিনিসই, একটা লেখার টেবিলে সাধারণত যা যা থাকে। কাগজ, ছুরি, পেন্সিল, রবার, আলপিন, পেপার ক্লিপ, এ সমস্ত। একটা পেট্রল লাইটার আর একটা দামী কলমও আছে। একটা ড্রয়ারে পাওয়া গেল ভাঁজ করা এক তা টিস্যু

পেপার, একটা টুকরো কেটে নেয়া হয়েছে ওটা থেকে। স্কেচ আঁকা হয়েছে যে কাগজটায়, পকেট থেকে সেটা বের করে কাটা জায়গায় বসিয়ে দেখল কিশোর। খাপে খাপে মিলে যায়।

'কাগজটা কোনখান থেকে কেটে নেয়া হয়েছে, সেটা জানলাম,' আপনমনে বিড়বিড় করল সে, 'তবে তাতে কোনও লাভ হচ্ছে না।'

প্রচুর বই আছে। সেগুলোতে খুঁজতে যাওয়া খুব সময়সাপেক্ষ, ধৈর্যের ব্যাপার। টেবিলে রাখা একটা ম্যাপের ওপর ঝুঁকে থাকল কিছুক্ষণ কিশোর। নাবিকেরা যে ধরনের দাগ আর চিহ্ন দিয়ে থাকে, সেসব খুঁজল। দেয়ালের ম্যাপগুলোতেও একই জিনিস খুঁজল। না পেয়ে শেষে নামিয়ে এনে টেবিলে বিছিয়ে আলোর নিচে রেখে ভালমত দেখল। কিন্তু কিছুই পেল না। কম্পাস কিংবা ডিভাইডারের পিনের অতি খুদে ছিদ্রটুকুও নেই কোথাও, নেই রুলার রেখে হালকা পেন্সিলে দাগ টানার চিহ্ন। যেখানে ঝোলানো ছিল ওগুলো, সেখানে ঝুলিয়ে দিয়ে এল আবার।

ওমরও খুঁজছে। বার বার চোখ যাচ্ছে ওর ডিমটার ওপর। শেষে গিয়ে তুলেই নিল হাতে। 'এটা এখানে কেন?'

পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'আমিও এই কথাটাই ভাবছিলাম। ঘরের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মেলে না।'

'ডিম তো সাধারণত খাওয়ার জন্যেই ঘরে আনে লোকে।'

'তাহলে রান্নাঘরে থাকার কথা, লাইব্রেরিতে নয়।'

'ঘরের আশেপাশে কোন মুরগীর খোঁয়াড়ও তো দেখলাম না।'

'মুরগীর ডিমের চেয়ে বড় এটা।'

'অনেক সময় এক-ডিমের মধ্যে দুটো কুসুম থাকে। তাতে বড় হয়ে যায়।'

'জানি। তবু এতবড় হয় না।'

হাতের তালুতে রেখে ডিমটা দেখতে লাগল ওমর। মুরগীর ডিমের অন্তত তিনগুণ বড়। চকের মত সাদা। 'সাধারণ মুরগীর ডিম নয় এটা। কোনখান থেকে নিয়ে এসেছিল হেস। কেন?'

'সংগ্রহের বাতিক তো আছে দেখাই যাচ্ছে। ডিম সংগ্রহ শুরু করেছিল হয়তো।'

'তাহলে ফুটো করে ডিমের ভেতরের কুসুমটুসুম সব ফেলে দিয়ে শুধু খোসাটা রাখত,' হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করতে করতে বলল ওমর। 'ছোটবেলায় একবার ডিম সংগ্রহের নেশায় পেয়েছিল আমাকে। অনেক ডিম জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু এরকম ডিম কখনও দেখিনি।' ডিমটা আবার আগের জায়গায় রেখে দিল সে।

'তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পৃথিবীর সব পাখির ডিম সংগ্রহে রাখতে হলে সারাজীবন শুধু ডিমই খুঁজে বেড়াতে হবে। তাতেও পারা যাবে কিনা সন্দেহ,' টেবিলের কাছে ফিরে গেল কিশোর।

'কি করছ?'

'ড্রয়ারের ভেতরে লুকানো গুপ্তকুঠরি আছে কিনা দেখছি। আগের দিনে তো টেবিলে ওসব রাখত লোকে।'

'এত সহজেই যদি সেটা পেয়ে যাবে, তাহলে আর "গুপ্ত" হবে কেন?'

'তা ঠিক। আর যদি থাকেও, সেটার ওপর নিশ্চয় বিশেষ ভরসা করেনি হেস। তাহলে আলমারিটা কিনত না। কাঠের বাড়িতে যারা বাস করে, তারা অবশ্য আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে লোহার আলমারি কেনে, আগুন লেগে মূল্যবান জিনিস পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর জন্যে। যে জিনিসগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে হেস হিটলারের সই করা চিঠি, ছবি, টাকা, সবই আলমারিতে রেখেছিল।' চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর। 'সবই তো দেখলাম। বাকিটা রইল কি?'

হাত উল্টে ভুরু নাচাল ওমর, 'আমাকে জিজ্ঞেস করে কি লাভ?'

'চোখে পড়েও তো যেতে পারে কিছু। ডিমটার মত।'

'পাশের বাড়ির মিস্টার ডেভনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে কেমন হয়? তিনি হয়তো কিছু জানাতে পারবেন।'

'পুলিশ তো কিছু জানতে পারেনি।'

এক কাঁধ উঁচু করে শ্রাগ করল ওমর। 'পুলিশ পারেনি। আমরা যে পারব সেরকমও কোন সম্ভাবনা নেই।' সিগারেট ধরাল সে। 'তবে কথার মধ্যে ফাঁক থাকে অনেক সময়। কোনখান থেকে যে কি বেরিয়ে আসবে, কেউ বলতে পারে না। সেজন্যেই তো আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক প্রশ্ন হাজারবারও করা হয়।'

ওমরের যুক্তিটা মেনে নিল কিশোর। আলমারিটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট পর ডেভনের বাড়িতে পৌঁছল ওরা। একজন নিগ্রো চাকর পথ দেখিয়ে ওদের নিয়ে এল বসার ঘরে। বয়স্ক একজন হাসিখুশি মানুষ হাসিমুখে স্বাগত জানালেন ওদের। বয়েস হলেও স্বাস্থ্য এখনও যথেষ্ট ভাল। বয়েসের ভারে নুজ নন, কিংবা ভেঙে পড়েননি।

ওমরের দিক থেকে কিশোরের দিকে, তারপর আবার ওমরের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো তাঁর, 'বলুন, কি করতে পারি?'

ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে গেল কিশোর, এটা বসার ঘর না ন্যাচারাল হিস্টরির মিউজিয়াম! তারপর মনে পড়ল, মিস্টার ডেভন একজন প্রকৃতিবিদ। দেয়ালের প্রতিটি ফোকর থেকে উঁকি দিয়ে আছে স্টাফ করা পাখির মুখ। ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ কাঁচের চোখ একই রকম ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে অতিথিদের দিকে।

'আমরা আমেরিকা থেকে এসেছি। গোয়েন্দা,' পরিচয় দিল ওমর। 'আপনার পড়শী মিস্টার হেস হফনারের কেসটার তদন্ত করার জন্যে। তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি এখন কে পাবে, সেটা জেনে যাওয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'ও.' হাসলো ডেভন। চোখের বিস্ময় চাপা দিতে পারলেন না, কিংবা দেয়ার

চেষ্টা করলেন না। 'আরও কত লোক লাগানো হয়েছে এই একটা সাধারণ কাজের জন্যে?'

এবার চমকানোর পালা ওমরের। 'বুঝলাম না?'

'আপনাদের আগেই এসে একজন একই কথা বলে আলাপ জমানোর চেষ্টা করেছে আমার সঙ্গে। লোকটাকে পছন্দ হয়নি আমার।'

'চেহারাটা কেমন বলতে অসুবিধে আছে?'

'মোটেও না।'

ব্রন ডুগানের চেহারার বর্ণনা শুনে অবাক হলো না কিশোর।

'ওকে যা যা বলেছি, এ ছাড়া নতুন আর কিছুই বলার নেই আপনাদের,' ডেভন বললেন। 'কয়েকবার দেখা হয়েছে আমার ক্রাগেনের সঙ্গে। দীর্ঘক্ষণ কথাও হয়েছে। তারপরেও তাকে বুঝতে পারিনি। আন্তরিকতার অভাব ছিল বলব না, তবে ওই যে আছে না, ভেতরের মানুষটাকে চিনে নেয়া–সেটা কোনমতেই পারিনি। অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা মনে হয়েছে আমার কাছে। কোন ডিপার্টমেন্টে ছিল, বের করতে পারিনি। খুব বেশি খাতির জমানোর চেষ্টাও অবশ্য আমি করিনি। ওসব করতে গেলে সময় দেয়া প্রয়োজন। তাতে আমার কাজের ক্ষতি হত। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমি একজন পক্ষীবিদ,' দেয়ালের পাখিগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি, 'গবেষণা নিয়েই থাকতে হয়, সামাজিকতার সময় কোথায়? রক্তের সম্পর্কের কেউ তার আছে কিনা, আত্মীয়-স্বজন কোথায় কে আছে, কোনদিন বলেনি আমাকে। আমিও জিজ্ঞেস করিনি। করার কোন প্রয়োজন মনে করিনি। আলোচনা যে বিষয় নিয়ে করেছি, আমার তরফ থেকে খানিকটা স্বার্থপরতাই বলতে পারেন–আমার গবেষণায় সাহায্য হয় এমন সব কথাবার্তা।'

'তারমানে পাখি?'

নিজের পছন্দের বিষয় চলে আসায় স্বস্তি বোধ করলেন ডেভন। 'হ্যাঁ। ওদের ব্যাপারে তথ্য দিত আমাকে ক্রাগেন। কোথায় থাকে, কি করে; কখন কোথায় মাইগ্রেট করে সব এসে বলত। মাঝে সাঝে আশেপাশের দ্বীপ থেকে নমুনা জোগাড় করে দিত। ছোট একটা ইয়ট আছে ওর। ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ত।'

'তাই?'

মাথা ঝাঁকালেন ডেভন। 'ঘন ঘন বেরোত না। তবে যখন বেরোত, অনেক দূরে চলে যেত বোধহয়, কারণ ফিরত অনেক দেরি করে।'

মাথা দোলাল ওমর।

'ক্রাগেনের মৃত্যুটা আমার অনেক ক্ষতি করে দিল,' দুঃখ করে বললেন ডেভন।

'কেন?'

হাসলেন ডেভন। বোকা বোকা দেখাল হাসিটা। 'সেটা আপনাদের বলা ঠিক হবে না। আইনবিরুদ্ধ একটা কাজ করাতে চেয়েছিলাম তাকে দিয়ে। যদিও তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়। থাকগে, বলেই ফেলি। এক সময় পশ্চিম

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে প্রচুর ফিনোকপ্টারিবা রাবার ছিল।'

ওমরের মুখের অবস্থা যা হয়েছে দেখে হেসে ফেললেন ডেভন। 'বুঝলেন না? বৈজ্ঞানিক নাম। এক ধরনের অতি সুন্দর পাখি। সাধারণ নাম স্কারলেট ফ্ল্যামিঙ্গো।'

ওমরকে আটকে রাখা দম ছাড়তে দেখে আবারও হাসলেন তিনি। 'কিন্তু এখন আর তেমন দেখা যায় না। প্রাণীজগতের আরও নানা প্রজাতিকে যেভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে মানুষ, এদেরকেও সেভাবেই করেছে। মাংস আর পালকের জন্যে পাইকারি হারে শিকার করে, ডিম খেয়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এতই কমে গেছে, বড়জোর আর দুটো কি তিনটে ঝাঁক টিকে আছে কোনমতে। যতদূর জানি, বাহামায় আছে দুটো কলোনি। একটা ইনাগুয়া দ্বীপে, অন্যটা অ্যানড্রোজে; দুটোই এখান থেকে বহুদূর। আইন করে ওই পাখি মারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে সরকার। ইংল্যান্ড-আমেরিকার জীববিজ্ঞানী আর পক্ষীপ্রেমিকদের চাপে পড়ে পাখিগুলোকে পাহারা দেয়ার জন্যে লোক রাখতেও বাধ্য হয়েছে। তবে সেটা নামকা ওয়াস্তে। দুই দ্বীপের জন্যে একজন। পাখির বাসার ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখার নির্দেশ আছে তার ওপর। এসব তথ্যের অনেকটাই আমি ক্রাগেনের কাছ থেকে জেনেছি।'

হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলেন ডেভন। 'পাহারাদার লোকটা কি এখন ইনাগুয়ায়, না অন্য দ্বীপটাতে, জানি না আমি। এখানকার কেউই জানে বলে মনে হয় না। শুধু পাখি দেখতে কে আর যাবে ওখানে। ট্যুরিস্টরা অবশ্য যায়, যারা পাখি পছন্দ করে। তাদের সংখ্যাও কম। ক্রাগেন ওদিকে যায় অনুমান করে ফ্ল্যামিঙ্গোর একটা ডিম এনে দিতে বলেছিলাম তাকে। আমাকে কথা দিয়েছিল, দেবে। পাখির ঝাঁক আর বাসার ছবিও এনে দেবে বলেছিল। বাসাগুলো নাকি ভারি অদ্ভুত। মাটি দিয়ে মিনারের মত উঁচু করে বানায়। প্রতিটি মিনারের চূড়ায় একটা করে ডিম পাড়ে।'

ভুরু উঁচু করে ফেলল ওমর। 'কোনখান থেকে ওই ডিম এনে দেবে আপনাকে, বলেছিল নাকি ক্রাগেন?'

'বলেছে ছোট একটা দ্বীপ। ইনাগুয়াও নয়, অ্যানড্রুজও নয়। ওই দুটো ছাড়াও নাকি আরেকটা নির্জন ছোট দ্বীপে গিয়ে কলোনি করেছে কিছু ফ্ল্যামিঙ্গো।...কিন্তু এখন আমার আশা ভরসা সব শেষ। ক্রাগেন গেল মরে। আর কিছুই পাব না। ডিম, বাসার ছবি, কোনটাই না।'

'ডিমগুলো দেখতে কেমন?'

'মুরগীর ডিমের তিনগুণ বড়। চকের মত সাদা।'

হেসের বাড়ির ম্যানটলপীসে রাখা ডিমটার কথা ভাবল ওমর। 'কোন দ্বীপে এই ছোট কলোনিটা আছে, ক্রাগেন কোন ইঙ্গিতও দেয়নি?'

'নাহ্। জিজ্ঞেস করেছি, এড়িয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল কোন কারণে নামটা গোপন রাখতে চাইছে সে। তবে আমার বিশ্বাস, ইনাগুয়ার আশেপাশেই কোথাও হবে ওটা। মূল কলোনির কাছ থেকে বেশি দূরে যেতে চায় না আজকাল ফ্ল্যামিঙ্গোরা। আর ল্যাগুনের কাছাকাছি থাকতেই পছন্দ করে।'

'কেন?'

'প্রথমত, খাবার। ল্যাগুন থেকে মাছ, শামুক আর ছোট ছোট জলজ প্রাণী শিকার করে খাওয়া ওদের জন্যে সহজ। তা ছাড়া দ্বীপের যেখানে সেখানে বাসা বানানোকে আর নিরাপদ মনে করে না ওরা। ল্যাগুনের মাঝে গজিয়ে ওঠা চড়ার দিকেই নজর বেশি। শত্রুর ভয়ে চলে যায় পানির বেষ্টনির মধ্যে। এটা যে আরও বেশি বোকামি, বোঝে না ওরা। বেশি বৃষ্টিপাতে পানি বেড়ে প্লাবন হয়ে গেলে ওসব বাসা ধসে পড়ে, ডিম হারিয়ে যায়। বাসার চারপাশে প্রচুর কাদার প্রলেপ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করে অবশ্য। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষই যেখানে অসহায়, ওরা আর কি করবে।'

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর। চোখাচোখি হলো দুজনের। আবার ডেভনের দিকে ফিরল সে। 'কয়েক দিনের মধ্যে ক্রাগেনের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'না। বেশ কিছুদিন যাইনি।'

'সেজন্যেই খবরটা পাননি। একটা ডিম আপনার জন্যে নিয়ে এসেছিল ক্রাগেন।'

'অনেক দিন দেখা হয় না তার সঙ্গে। মৃত্যুর খবর শুনে খুব দুঃখ পেয়েছি। আজব লোক....' হঠাৎ যেন ওমরের কথাটা মাথায় ঢুকল ডেভনের। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ডিম নিয়ে এসেছিল!'

'আমার তাই ধারণা,' হাসল ওমর। 'একটা ডিম দেখে এলাম ম্যানটলপীসে। আপনি যেমন বললেন, ঠিক সেই রকম।'

'সাংঘাতিক একটা খবর শোনালেন, সাহেব! এতক্ষণ বলেননি কেন?' চিৎকার করেই বললেন ডেভন।

'খবর না পাওয়ার তো কোন কারণ দেখি না। বেআইনী কাজটা ক্রাগেন করেছে, ডিম এনে। আপনি করেননি। যে পাখিটার ডিম, তাকে তো আর চিনে নিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে আসা যাবে না। অতএব নষ্ট না করে একজন পক্ষীপ্রেমিকের সংগ্রহে চলে যাওয়াটাই সবদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত। আমার অন্তত সেটাই ভাল হবে মনে হয়।'

'কখন পাব? এখন গেলে পাওয়া যাবে?' অস্থির হয়ে উঠেছেন ডেভন।

'এইমাত্র তালা দিয়ে এলাম। আজ আর যেতে চাই না। তবে চাবি রেখে যেতে পারি আপনার কাছে। তাতে আমার বয়ে বেড়ানোরও ঝামেলা থাকবে না, আবার যখন ইচ্ছে এসে চাইলেই পাওয়া যাবে। আপনিও যখন খুশি গিয়ে ডিমটা নিয়ে আসতে পারবেন। পড়ার ঘরে আছে, ম্যানটলপীসের ওপর।'

'নিশ্চিন্তে রেখে যান। যখন খুশি এসে চাবি চাইবেন। রাত দুপুরে হলেও ক্ষতি নেই।'

'তাহলে তো খুবই ভাল।' চাবির গোছাটা বের করে দিল ওমর।

'আপনারা ফিরবেন কখন?' ওমর আর কিশোরকে দরজায় এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলেন ডেভন।

'জানি না এখনও। কি করব ঠিক করিনি। আপনার সাহায্যের জন্যে

ধন্যবাদ। ও, হ্যাঁ, ভাল কথা। ওই লোকটা যদি আবার আসে, ওই বিদেশীটা, যে আপনার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেয়েছিল, সোজা হাঁকিয়ে দেবেন। ও একটা ঠগ। চুরি, ডাকাতি সবই করেছে। আমেরিকার পুলিশ ওকে খুঁজছে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করল ওমর। 'আচ্ছা, ফ্ল্যামিঙ্গোর কথাটা ওকে বলে দেননি তো?'

কপাল কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করলেন ডেভন। 'নাহ্, বলিনি বোধহয়···ইয়টে করে ক্রাগেন কোথায় যেত, জিজ্ঞেস করেছিল। বলেছি, জানি না। বাহামার ওদিকে যেতটেত, ফ্ল্যামিঙ্গোর দ্বীপগুলোর কাছে দিয়ে–এরকম কিছু বলে থাকতে পারি। মনে পড়ছে না।'

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। 'আচ্ছা, মিস্টার ডেভন, এখানে কি সাপ আছে?' ডেভনের বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম কথা বলল সে।

'সাপ!' অবাক মনে হলো ডেভনকে। 'না, নেই। আমি অন্তত এতদিনে একটাও দেখিনি। তবে কোন কোন দ্বীপে সাংঘাতিক বিষাক্ত একজাতের সাপ আছে, ফার-ডি-ল্যান্স। ত্রিনিদাদে তো অভাব নেই ওগুলোর। মারটিনিক, সেইন্ট লুসিয়া আর টোবাগোতে আখের খেতে কাজ করতে গিয়ে রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে থাকে চাষীরা, কখন কামড় খেতে হয়।'

'নামটা বড় অদ্ভুত, ফার-ডি-ল্যান্স। শুনেছি, তিনকোনা মাথার জন্যেই এই নাম হয়েছে? বল্লমের ফলার মত মাথা?'

'ঠিকই শুনেছ। শুধু বল্লমের মত মাথাই নয়, আক্রমণের ধরনটাও ওই রকম। বল্লম ছুঁড়লে যেমন করে উড়ে যায়, ওরাও ওরকম করে লাফ দেয়। ছয় ফুট লম্বা, ধূসর-বাদামী রঙ, শরীর ঘিরে কালো কালো আঙটির মত দাগ, দাগের দুই কিনার আবার হলদে-সবুজ। দেখলে ভয় না পেয়ে উপায় নেই। সাপের কথা জিজ্ঞেস করলে কেন হঠাৎ?'

'এমনি। মনে হলো। শুনেছিলাম, জ্যামাইকায় আছে এই সাপ।'

হেসে বললেন ডেভন, 'ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কিংসটনে ওদের দেখা পাবে না।' ওমরের দিকে তাকালেন, 'আচ্ছা, গুড-বাই। কোন কিছুর দরকার হলে বিনা দ্বিধায় চলে আসবেন আমার কাছে। সাহায্যের দরকার হলে বলবেন।'

চার

রোদের তাপ কমে গেছে। বিকেলের আলো-ছায়ায় মলিন হয়ে এসেছে রঙের চাকচিক্য। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে হেঁটে চলল ওমর আর কিশোর।

'চাবি রেখে এসে ভালই করেছি, কি বলো?' ওমর বলল।

'চাবির কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি, আমাদের মত একই খাতে চিন্তা করছে না তো ব্রন ডুগানও?'

'করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পাখির দ্বীপের কথা তো তাকে বলেই

দিয়েছেন ডেভন।'

'কিন্তু প্রশ্ন হলো, হেস বলেছিল ডেভনকে ডিম আর ছবি এনে দেবে–ডিমটা তো দেখলাম, ছবিগুলো কোথায়?' ওমরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর। 'ছবি তোলায় বাধা নেই, সহজ কাজ, ডিম আনাটাই বরং কঠিন। ডিম যখন এনেছে, ছবিও তুলেছে। গেল কোথায় ওগুলো? ঘরে তো কোথাও পেলাম না। কোন ক্যামেরাও নেই। নিয়ে গেল নাকি ডুগান? সঙ্গে করে একটা ব্যাগ এনেছিল, মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর। 'ছবি, ক্যামেরা, দুটোই?'

'হ্যাঁ। মদের কথা বলে আমাদের আগ্রহও ব্যাগের ওপর থেকে সরিয়ে দিল। ভীষণ চালাক লোক। ছবি পেলে আমাদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি জায়গামত চলে যেতে পারবে সে। কারণ ছবিতে বাসার পেছনের দৃশ্যপট থাকবে। সেটা থেকে বোঝা যাবে দ্বীপের চেহারা, আকৃতি। দ্বীপটাও হয়তো চিনে বের করা যাবে। অবশ্য এখন আর ভেবে লাভ নেই। যদি নিয়েই গিয়ে থাকে ডুগান, কি আর করব!'

'ডেভনকে জিজ্ঞেস করতে পারি, কোন্ দোকান থেকে ছবি ডেভেলপ করাত হেস। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতে পারি, গত কিছুদিনের মধ্যে ফ্ল্যামিঙ্গো পাখি কিংবা ওগুলোর বাসার ছবি ডেভেলপ করতে দিয়েছিল কিনা।'

'তা করা যায়।'

গাড়িতে উঠল দুজনে। কিন্তু তখুনি স্টার্ট না দিয়ে সিগারেট ধরাল ওমর। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়াতে ওড়াতে বলল, 'খুব একটা খারাপ এগোইনি আমরা, কি বলো? কাজ করার মত কিছু তথ্য পেয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর, 'ডিমটাকেই এখন সবচেয়ে বড় সূত্র বলে মনে হচ্ছে।'

'তা ঠিক। কাজ কমিয়ে দিল আমাদের। বোঝাই যাচ্ছে, ওই ডিম জোগাড়ের জন্যে দ্বীপটায় যায়নি হেস। গিয়েছিল অন্য কাজে। সে জানত, কোথায় ডিম পাওয়া যাবে। তাই এনে দেবে বলে কথা দিয়েছিল ডেভনকে। এমন কোন দ্বীপ সে চেনে, যেখানে ফ্ল্যামিঙ্গো কলোনি আছে।'

'আমার প্রশ্ন সেটাই। কি করে চিনল? কেন যায় ওখানে? অনুমান করা কঠিন নয়। দ্বীপের নামটা জানায়নি ডেভনকে। কেন জানাল না? কারণ, সে চায়নি অন্য কেউ জেনে যাক। চায়নি, জেনে গিয়ে বাকি কলোনিগুলোর মতই পরিচিত হয়ে উঠুক এই দ্বীপটাও, লোক যাতায়াত করুক। তাতে তার গোপন ভাণ্ডার আর গোপন থাকবে না। এখন আমাদের পয়লা কাজ দ্বীপটা খুঁজে বের করা, নকশার সঙ্গে ওটার আকৃতি মেলে কিনা দেখা। দ্বীপটা পেলে ফর্মূলাটা খুঁজে বের করা কঠিন হবে না।'

'দুটো প্রধান দ্বীপের কথা বলেছেন ডেভন।'

'হ্যাঁ, ইনাগুয়া এবং অ্যানড্রুজ। একটাতে না দেখেই বাদ দিতে পারি আমরা, অ্যানড্রুজ। এখান থেকে কয়েকশো মাইল দূরে। প্রচুর লোক বাস করে ওটাতে। হেসের জিনিস লুকানোর ক্ষেত্র হিসেবে মোটেও সুবিধেজনক

নয়। ইনাগুয়া অত জনবহুল নয়, তবুও আপাতত বাদ দেয়া যায়। নজর দিতে হবে ওটার আশেপাশে কোন উপদ্বীপ থাকলে; কিংবা ছোট দ্বীপগুলোর ওপর। ইনাগুয়ার কাছাকাছিই থাকার কথা হেসের নির্জন দ্বীপটা। মূল কলোনির কাছ থেকে দূরে যেতে চায় না ফ্ল্যামিঙ্গোরা। তাতে আমাদের সুবিধেই হলো। খোঁজার জায়গা সীমিত হয়ে গেল। কলম্বাস বে'তে গিয়ে এখন ম্যাপ দেখা দরকার আমাদের। কোন কোন জায়গায় খুঁজতে হবে দেখে নিয়ে বেরিয়ে পড়া যায়। তাড়াতাড়ি করলে অন্ধকার হওয়ার আগেই এক চক্কর দিয়ে আসতে পারব।'

'দারোয়ানকেও তো ভাগিয়ে দিয়ে এলাম। বাড়িটা ওভাবে পাহারা ছাড়া ফেলে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'হয়তো হবে না। তবে ডুগান আর না-ও আসতে পারে। তাকে বলে দেয়া হয়েছে ওই বাড়িতে থাকব আমরা। আমাদের উপস্থিতিতে চুরি করে বাড়িতে ঢোকার সাহস করবে বলে মনে হয় না। তবে যদি আসার ইচ্ছেই থাকে, আমরা থাকলেও আসবে, না থাকলেও আসবে। ঢুকবেই আবার, যেভাবেই হোক। তার আসার ভয়ে তো আর অন্য কাজ বাকি রেখে বসে থাকতে পারি না আমরা। বরং দ্বীপটা খুঁজতেই চলে যাই। এত তাড়াতাড়ি ডুগানের আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা কম,' ওমরের দিকে তাকাল কিশোর। 'না কি বলেন?'

'ঠিক আছে, তোমার কথাই সই,' স্টার্ট দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল ওমর। বিকেলের নীরবতাকে চিরে দিল তীক্ষ্ণ চিৎকার। মুহূর্তে মুখের পেশি শক্ত হয়ে গেল ওর। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল কিশোরের দিকে। সেইসাথে ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল একপাশের দরজা। 'এসো!' বলেই দৌড় দিতে গেল ডেভনের বাড়ির দিকে।

'এদিকে নয়, ওদিকে!' ক্রাগেন'স নেস্টের দিকে হাত তুলল কিশোর। গাড়ির ওইপাশটাতে বসা ছিল বলে ঠিকমত শুনেছে।

হেসের বাড়ির দিকে দৌড় দিল দুজনে।

ঘরের কাছে পৌঁছে থমকে গেল ওমর। বাগানের দিকের জানালাটা দেখিয়ে বলল, 'দেখো! বন্ধ করে গিয়েছিলাম আমরা, মনে আছে না?'

হেসের পড়ার ঘরের বিশাল জানালাটা এখন খোলা। কিশোরেরও স্পষ্ট মনে আছে, ওরা ঘর থেকে বেরোনোর সময় পাল্লা লাগানো ছিল।

তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা পেরোল ওমর। হলঘর পেরিয়ে গিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল হেসের পড়ার ঘরে। ঢুকেই চিৎকার করে উঠল 'সাবধান!' বলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একপাশে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা না খেলে মাটিতেই পড়ে যেত। হাতের নাড়া লেগে মেঝেতে পড়ে গেল একটা ছিপ।

কিশোরও ঢুকে পড়েছে। ব্রেক কষে যেন দাঁড় করাল নিজেকে। পিছলে গেল খানিকটা। পরক্ষণে লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে।

পরের কয়েকটা মিনিট যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হলো ওদের।

মাটিতে পড়ে আছেন ডেভন। একটা হাঁটু বাঁকা করে রেখেছেন, এক হাত মুখের ওপর। তাঁর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে একটা সাপ। মাথাটা বল্লমের

ফলার মত। দেহের রঙ বাদামী, তাতে গোল গোল আঙটি।

যে রকম রেগে আছে সাপটা, ডেভনের কাছে এখন যাওয়ার চেষ্টা করলেই কামড় খেতে হবে। ওটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে হাত বাড়াল ওমর। তুলে নিল একটা ছিপ। সাপটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়ি মারল মাথা সই করে। লাগল, তবে জায়গামত নয়। ছিপের মাথাটা ভেঙে গেল। আবার বাড়ি মারার জন্যে তুলল সেটা।

পরক্ষণে যা ঘটল, তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না কিশোর। অবিশ্বাস্য দ্রুত নিজের শরীরটাকে সোজা করে ফেলল সাপটা। বল্লমের মত। ওকে কাছে দেখে ওর দিকেই লাফ দিল। দ্রুত সরতে গিয়ে লেখার টেবিলটার ওপর পড়ে গেল সে।

প্রথমবার মিস করে, দ্বিতীয়বার আর তাকে আক্রমণ করল না সাপটা। ভয়ানক ফোঁস ফোঁস করতে করতে গিয়ে ঢুকে পড়ল বড় আর্মচেয়ারটার তলায়। এমন জায়গায়, যেখানে ওটাকে বাড়ি মারা যাবে না।

'তুমি সরো!' চিৎকার করে বলে ছিপের মাথা দিয়ে চেয়ারের তলায় খোঁচাতে শুরু করল ওমর, সাপটাকে বের করে আনার জন্যে। ওকে লক্ষ্য করে তেড়ে এল ওটা। বাড়ি মারল ওমর। লাগাতে পারল না। সাপটা তার চেয়ে দ্রুতগতি। ছোবল থেকে বাঁচার জন্যে লাফ দিয়ে একটা চেয়ারে উঠে পড়ল। ওখান থেকে বাড়ি মারতে গেলে ডেভনের গায়ে লাগবে। শেষে চেয়ারের পেছন দিকে লাফিয়ে নেমে, চেয়ারটা তুলেই ছুঁড়ে মারল ফণা দোলাতে থাকা সাপটার দিকে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে কিশোর। কি করবে বুঝতে পারছে না। ওমরকে সাহায্য করা দরকার। মেঝেতে পড়ে থাকা দ্বিতীয় ছিপটা তুলে নিতে লাফ দিল সে। তুলে নিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, অন্ধের মত বাড়ি মারল সাপটাকে। লাগলে কোমর ভেঙে যেত ওটার। কিন্তু ছিপের মাথা আটকে গেল একটা ঝুলন্ত ল্যাম্পে, ঝনঝন করে কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে, বাড়িটা লাগল গিয়ে সাপের লেজে। তা-ও এত আস্তে, কিছুই হলো না ওটার, বরং রাগিয়ে দিল আরও। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। তবে কি বুঝে আর ছোবল মারতে এল না। ছুটে ঢুকে পড়ল সোফার নিচে।

এমন জায়গায় রয়েছে ওটা, বাড়ি মারার উপায় নেই আর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে দুজনে। তাকিয়ে আছে সোফাটার দিকে।

'মাথা দেখতে পাচ্ছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

'গুঁতো মারো,' পরিশ্রমে খসখসে হয়ে গেছে ওমরের কণ্ঠ। 'তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। দেরি হয়ে গেলে ডেভনকে বাঁচানো যাবে না।'

ছিপ দিয়ে গুঁতানোর সাহস পেল না কিশোর। পিতলের একটা লম্বা মোমদানি তুলে নিয়ে সাপের মাথা সই করে ছুঁড়ে মারল। এবং যথারীতি মিস করল। তবে একটা উদ্দেশ্য সফল হলো, বেরিয়ে এল সাপটা।

বাড়ি মারতে দেরি করে ফেলল ওমর। লাগল না। ফেলে রাখা ছিপ তুলে আবার বাড়ি মারতে গিয়ে কিশোরও দেরি করে ফেলল। জানালার কাছে চলে

গেছে ততক্ষণে সাপটা। লাফ দিয়ে চৌকাঠে উঠল। চৌকাঠ গলিয়ে চলে গেল বাইরে। নিঃশব্দে হারিয়ে গেল লম্বা ঘাসের মধ্যে।

'যাক, মরুকগে!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ওমর। 'যেয়ো না আর!'

'মাথা খারাপ! মরব নাকি গিয়ে! কিন্তু ঘরে আর নেই তো?'

'থাকলে কিছু করার নেই,' হাঁটু গেড়ে ডেভনের পাশে বসে পড়ল ওমর। বেহুঁশ হয়ে গেছেন তিনি।

কিশোরও এসে বসল পাশে।

'দেখি, তোমার ছুরিটা,' হাত বাড়াল ওমর।

পকেট থেকে সুইস-নাইফটা বের করে দিল কিশোর।

কোন জায়গায় কামড় খেয়েছেন ডেভন, দ্রুত বের করে ফেলল ওমর। বাঁকা করে রাখা হাঁটুর পেছনে গোড়ালির ওপরের মাংসে। প্যান্টটা চিরে ফেলল সে। ছুরির মাথা দিয়ে ক্ষতস্থানের ওপর আড়াআড়ি দুটো পোঁচ দিল। সেখানে মুখ লাগিয়ে চুষে রক্ত টেনে বের করতে শুরু করল। মুখভর্তি রক্ত থু-থু করে ফেলে দিল একপাশে। 'দেখো তো, ব্র্যান্ডিট্যান্ডি পাও নাকি?'

দৌড় দিল কিশোর। ডাইনিং রুম থেকে নিয়ে এল একটা বোতল।

'ঠোঁটে ঢেলে দাও,' ওমর বলল।

'ডাক্তার ডাকা দরকার,' ছিপি খুলতে খুলতে বলল কিশোর।

'কি করে ডাকবে? ফোনটোন তো দেখলাম না কোথাও। গিয়ে ডেকে আনতে হবে। ডাক্তারের জন্যে বসে থাকলে বাঁচানো যাবে না। তারচেয়ে যা করছি করি।'

ডেভনের ঠোঁট ফাঁক করে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল কিশোর। ভেতরেও গেল খানিকটা, ঠোঁটের কোণ বেয়ে বাইরেও পড়ল।

ছুরি দিয়ে কাটা দুটো আরও বড় করে দিল ওমর, যাতে বেশি করে বিষ মেশানো রক্ত বেরিয়ে চলে আসতে পারে। ফুলতে শুরু করেছে পা-টা।

দেয়ালের কাছে ডেভনকে তুলে নিয়ে এল সে। দেয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসিয়ে দিল। গালে চড় মারতে শুরু করল জোরে জোরে, 'ডেভন! মিস্টার ডেভন! শুনছেন?'

অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ডেভনের মুখ থেকে। চোখ মেললেন। ঘোলাটে দৃষ্টি।

কিশোরের দিকে তাকাল ওমর, 'জলদি একটা অ্যাম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করো। আমি ততক্ষণ জাগিয়ে রাখছি।'

দৌড়ে বেরোল কিশোর। গাড়ি নিয়ে শহরে ছুটল। ভাগ্য ভাল, পথেই দেখা পেল একটা আর্মির অ্যাম্বুলেন্সের। ধীরে সুস্থে চলেছে। চালাচ্ছে একজন কর্পোরাল।

তাকে থামিয়ে পরিস্থিতিটা জানাল কিশোর।

চিন্তা করতে মানা করে দিল কর্পোরাল। কিশোরকে চলে যেতে বলল। যা করার সে-ই করবে।

ক্রাগেন'স নেস্টে ফিরে এসে কিশোর দেখল, ক্রমশ নেতিয়ে পড়ছেন

ডেভন। অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সে আর ওমর।

দশ মিনিট পরই অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে গেল ক্রাগেন'স নেস্টে। ডাক্তার নিয়ে এসেছে কর্পোরাল।

তাড়াতাড়ি সিরাম পুশ করে দিলেন ডাক্তার। 'হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে,' ওমরকে বললেন। 'ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল, ঠিকমত সব করতে পেরেছেন আপনারা। বাঁচার আশা আছে।'

স্ট্রেচারে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলা হলো ডেভনকে। চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

ঘরে একা হয়ে গেল ওমর আর কিশোর। বিকেল শেষ। দ্রুত নামছে গোধূলির ছায়া।

'ভালই তো এগোচ্ছিল,' কপালের ঘাম মুছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে বলল ওমর, 'কিন্তু দিনটা শেষ হলো বড় বিশ্রী ভাবে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'ওই সাপটা আপনাআপনি এসে ঘরে ঢুকে পড়েনি,' আনমনে বলল। 'জ্যামাইকায় ফার-ডি-ল্যান্স নেই। অন্য কোনখান থেকে আনা হয়েছে। এনে ঘরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

'কোনই সন্দেহ নেই তাতে,' একমত হলো ওমর। 'এবং কাজটা ডুগানের।'

'সে নিজে করেনি, কাউকে দিয়ে করিয়েছে। এত মারাত্মক প্রাণী সে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাবে না। কিন্তু হুমকি দিয়ে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি কাজে পরিণত করে ফেলবে ভাবতে পারিনি। কাউকে দিয়ে সাপটা পাঠিয়ে দিয়েছে সে। যাতে ঢুকলেই আমরা কামড় খেয়ে মরি।'

'তারমানে নজর রাখা হচ্ছে আমাদের ওপর?'

'না-ও রাখতে পারে। দরকার তো নেই। আমরা এখানে থাকব, বলেই দিয়েছি ডুগানকে। তাই আমাদের মারার ব্যবস্থা করেছিল। অন্য কেউ যে ঢুকে পড়বে, কল্পনাই করেনি।'

'কিন্তু ঘরে ঢুকল কি করে লোকটা? যাকে দিয়ে পাঠাল?'

'পাল্লার কাঁচ ভেঙে জানালা খুলেছে।' হাত তুলল কিশোর, 'ওই দেখুন। ছিটকানির কাছের কাঁচটা ভাঙা।'

এতক্ষণে ডিমটার ওপর চোখ পড়ল ওর। মেঝেতে পড়ে আছে। খোসা ভেঙে কুসুম বেরিয়ে ছড়িয়ে আছে। রক্তের মত টকটকে লাল।

'ওই ডিমটাই এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল আমাদের,' কিশোর বলল। 'নইলে কামড়টা আমাদেরই কাউকে খেতে হত। ডেভন বেঁচে থাকলে এর পুরস্কার হিসেবে আরেকটা ডিম তাঁকে এনে দিতে হবে।'

'নিতে এসেই কামড়টা খেল বেচারা!' আফসোস করল ওমর।

'হ্যাঁ। শোনার পর আর একটা সেকেন্ডও দেরি করতে পারেননি।'

বাড়ির পেছনের রাস্তা দিয়ে এসে বাগানের দিকের দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছেন ডেভন। তালার ফুটোয় চাবির গোছা ঝুলতে দেখে বোঝা গেল। পেছনের রাস্তা দিয়ে শর্টকাটে এসেছেন বলে সামনের রাস্তায় বসা ওমর আর

কিশোরও তাঁকে হেসের বাড়িতে ঢুকতে দেখেনি।

'এতটাই তাড়াহুড়ো করেছেন,' আবার বলল কিশোর, 'সামনের দরজা দিয়ে ঢোকার তরটাও সয়নি। সরাসরি স্টাডিতে ঢুকেছেন এবং ঘরে ফেলে যাওয়া ইবলিসটার কামড় খেয়েছেন।'

'দুঃখের বিষয়, মারতে পারলাম না। ইবলিসটা এখন বাগানে। কোথায় যে লুকিয়ে আছে কে জানে। বাগানে বেরোলেই হয়তো কামড় খেতে হবে। থাক বসে। আমি আর ওদিকে যাচ্ছিই না।' জানালাটা লাগিয়ে দিল ওমর। দরজা বন্ধ করে, তালা আটকে চাবির গোছা পকেটে ফেলল। 'চলো, যাই। মুসা আর রবিন নিশ্চয় আমাদের দেরি দেখে অস্থির হয়ে পড়েছে।' বাইরে বেরিয়ে বলল, 'সাবধান! দেখেশুনে পা ফেলো! কোথায় লুকিয়ে আছে বদমাশটা কে জানে!'

'অত ভয় করছি না আমি। একটু আগে একবার তো বেরোলাম। অ্যাম্বুলেন্স এল। হই-চই আর গাড়ির শব্দে নিশ্চয় দূরে চলে গেছে ওটা।'

তবু অসাবধান হলো না। সাপটা আছে কিনা দেখতে দেখতে, ঘাস আর ঝোপঝাড় এড়িয়ে ড্রাইভওয়ের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এল ওরা গাড়ির কাছে।

শ'খানেক গজ এগোতেই রাস্তা ধরে আসতে দেখল একটা লোককে। উদ্ভট পোশাক পরা সেই লম্বা নিগ্রো।

'ফ্রিক সায়া!' বলে উঠল কিশোর।

শক্ত হয়ে চেপে বসল ওমরের ঠোঁট। 'ত্রিনিদাদের স্যাগা বয়েজদের নেতা। আর ত্রিনিদাদ হলো বল্লম-সাপের আড্ডাখানা।'

'ওই বদমাশটাই তাহলে এ কাজ করেছে! আমরা মরলাম কিনা দেখতে আসছে।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। তা নাহলে ওর এদিকে আসাটাকে এখন কাকতালীয় ধরে নিতে হয়।'

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির ভেতর চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল ফ্রিক। ধীরে ধীরে কালো ঠোঁট ফাঁক হয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল। মাথা থেকে বিরাট কানাওয়ালা হ্যাটটা খুলে নিয়ে বাউ করল ওদের উদ্দেশে। যেন বোঝাতে চাইল: এবার হলো না বটে, পরের বার দেখা যাবে।

পাঁচ

পরদিন সকালে বিমান নিয়ে রওনা হলো ওরা। উড়ে চলল উত্তর-পশ্চিমে। গভীর নীল আকাশ। সাগর তারচেয়ে নীল। গন্তব্য: ইনাগুয়া। ফ্ল্যামিঙ্গো বাস করে যে দুটো দ্বীপে, তার মধ্যে কাছে ওটা। বাহামা দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে কাছের দ্বীপ। জ্যামাইকা থেকে কাছে, তারপরেও কিউবা আর হাইতির মাঝখান দিয়ে বিখ্যাত উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজ ধরে যেতে গেলে তিনশো মাইল।

ম্যাপ আর অ্যাডমিরালটি চার্টে প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু কোনটাই আগ্রহ

জাগাতে পারল না কিশোরের। জানল, ইনাগুয়া দুই ভাগে বিভক্ত–গ্রেট ইনাগুয়া আর লিটল ইনাগুয়া। শেষের অংশ, অর্থাৎ দ্বীপের ছোট অংশটা রয়েছে একেবারে উত্তর প্রান্তে।

ফ্ল্যামিঙ্গো আছে অন্য যে দ্বীপটায়, অ্যানড্রুজ, সেটা রয়েছে আরও বহুশত মাইল উত্তরে। ওটাকে আরও একটা কারণে খোঁজার তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়: জ্যামাইকা থেকে অতদূরে তার মূল্যবান দলিল লুকাতে চাইবে না হেস। যতটা সম্ভব হাতের কাছে রাখতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক।

দ্বীপ হিসেবে গ্রেট ইনাগুয়া যথেষ্ট বড়। প্রায় আটশো বর্গমাইল। এর বেশির ভাগটা জুড়েই রয়েছে অবশ্য পানি, বিশাল এক ল্যাগুন, যাকে ঘিরে আছে মাটি, অর্থাৎ দ্বীপটা। দ্বীপের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য অবশ্য ওখানকার সব দ্বীপেরই আছে, সেভাবে নামকরণও করা হয়েছে ওগুলোর। যেমন, প্রবালদ্বীপ, মরুদ্বীপ, রত্নদ্বীপ; কোনটা সবুজ গাছপালায় ছাওয়া, কোনটাতে শুধু বালি আর পাথর, কোনটাতে গাছপালা, বালি, পাথর, পাহাড়, টিলা সবই আছে, সেই সঙ্গে রয়েছে গুপ্তধনের গুজব, পাওয়াও গেছে কোথাও কোথাও। যাই হোক, ইনাগুয়ার ওই ল্যাগুনেই লাল ফ্ল্যামিঙ্গোর বাসা। কেউ কেউ ফায়ারি ফ্ল্যামিঙ্গো বা আগুনে ফ্ল্যামিঙ্গোও বলে এদের। এক সময় প্রচুর নিগ্রো বাস করত এই দ্বীপে। কমতে কমতে সেটা হাতে গোণা কিছু বস্তিতে এসে ঠেকেছে। পুরানো, বিবর্ণ বাড়ি নিয়ে গড়ে ওঠা এই জনবসতির নাম এখন ম্যাথু টাউন। দ্বীপে কাজ নেই, তাই কর্মের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি জমিয়েছে নতুন জেনারেশন। প্রথম যখন ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা আসে এখানে, যেমন দেখেছিল, বর্তমানে আবার সেই অবস্থা হয়েছে দ্বীপটার।

এক প্রান্তে ওটার আটলান্টিক মহাসাগর। তাতে হাজার হাজার দ্বীপ, উপদ্বীপ, প্রবাল প্রাচীর নিয়ে যে দ্বীপপুঞ্জ তৈরি হয়েছে, সেটাই বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। এগুলোর মধ্যে দিয়ে জ্যামাইকায় আসতে হয়েছিল হেসকে। পথে কোন একটা দ্বীপে থেমে লুকিয়ে ফেলেছিল সঙ্গে করে নিয়ে আসা মূল্যবান দলিল, সোনাদানা। উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজ ধরে যেখান দিয়ে ক্যারিবিয়ান সী'তে ঢুকেছিল সে, ইনাগুয়ার পাশ কাটিয়েছিল, তার কাছাকাছি উড়ছে এখন ওমরের ভাড়া নেয়া পুরানো আমলের অটার বিমান।

কোথায় লুকানো আছে ফর্মূলাটা? নকশা বা ম্যাপ ছাড়া হেসের ওই দলিল খুঁজে পাওয়া কয়েকশো খড়ের গাদায় একটা সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন মনে হলো ওর কাছে। হবে না এভাবে। সূত্র লাগবে। যে লুকিয়েছে তার নির্দেশনা দরকার। নইলে পাবে না ওই দলিল।

ছোট ছোট বিন্দু, বিন্দুর চেয়ে সামান্য বড় বেশ কিছু জলযান দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, ডাঙা থেকে বহুদূরে। উত্তরে দ্রুতগতিতে একটা যাত্রীবাহী বড় জাহাজ ছুটে চলেছে উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজের দিকে, পেছনে লম্বা লেজের মত রেখে যাচ্ছে সাদা ঢেউয়ের মোটা রেখা। দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে আরেকটা ছোট জাতের জলযান, মনে হয় স্থির হয়ে আছে, কিন্তু বেশ জোরেই যে চলছে ওটা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ একটু পরেই আবার যখন তাকাল ওমর,

দেখতে পেল না আর। দূরে বলেই স্থির লাগছিল।

ডেভনের কথা ভাবল সে। রওনা হওয়ার আগে হাসপাতালে ফোন করে খোঁজ নিয়েছিল। ডাক্তার আশ্বস্ত করেছেন, বিপদ কেটে গেছে। কয়েক দিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হতে পারে হয়তো, তবে আর কোন ভয় নেই। বেঁচে গেছেন ডেভন।

প্রথমবার বেরিয়েই হেসের লুকানো জিনিসটা পেয়ে যাবে, এমন আশা অবশ্য করছে না ওমর। সে এসেছে ইনাগুয়ার আশপাশটা দেখে যেতে, কোথায় নতুন কলোনি করেছে ফ্ল্যামিঙ্গোরা। যদি এমন হয়, একটা নয়, একাধিক নতুন কলোনি করেছে পাখিগুলো, যার কথা হেসেরও জানা নেই, তখন? আসলটা বাদ দিয়ে ওগুলোরই কোন একটা আবিষ্কার করে বসল হয়তো ওরা, খুঁজে খুঁজে সারা হয়ে যাবে, পাবে না ফর্মূলাটা। সূত্র আছে একটাই, হেসের আঁকা নকশা। দ্বীপটা ওই আকৃতির হতে হবে। কিন্তু আসলেই কি নকশা এঁকে দ্বীপ বুঝিয়েছে হেস? নাকি ল্যাগুন? না অন্য কিছু? মুশকিল আরও আছে, নকশাটাতে স্কেল দেয়া নেই। তাই বোঝারও উপায় নেই, দ্বীপ কিংবা ল্যাগুন হলে ওটা কত বড়। কয়েক গজ থেকে কয়েক মাইলও হতে পারে।

বেলা দশটা নাগাদ কিউবা ও হাইতিকে একপাশে রেখে উড়ে চলল অটার। সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। সাদা ফেনা জমছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে সাদা মালায় ঘিরে রেখেছে দ্বীপ দুটোকে।

ওগুলো যতই পেছনে পড়তে থাকল সামনে ভেসে উঠতে লাগল গ্রেট ইনাগুয়ার বুক। পানিতে ভেসে থাকা চ্যাপ্টা সমতল একটা শিং যেন। তার পেটে ল্যাগুনটা ঢুকে বসে আছে বিরাট এক গর্তের মত।

কাছাকাছি পৌঁছে কিছুটা নিচে নামল ওমর।

ককপিটে ওর পাশে বসা কিশোর আগ্রহ আর কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে। এক ভ্রমণকারী দ্বীপটাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিল: রহস্য আর রোমান্টিকতায় ঘেরা বিরাট এক ভূমিখণ্ড। তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারল না সে। রহস্য আছে ঠিকই, তবে রোমান্টিক হওয়ার মত কোন কিছু দেখতে পেল না। ঘন সবুজ বন নেই, নেই কোন রহস্যময় নীল পাহাড়ের চূড়া কিংবা গুপ্তনদী–জলদস্যুদের রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীতে যে সব হরদম পাওয়া যায়। বিশাল এক স্লেটের মত লাগছে দ্বীপটাকে। স্লেটের মত রঙ, মাঝে মাঝে সাদা সাদা ছোপ। ওগুলো লবণ ক্ষেত্র। লবণ তৈরি হয়। মানুষের আস্তানা। মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে আছে ধবধবে সাদা বালির সৈকত। কিনারের পানি হালকা আকাশী। সাগরের গভীরতা ওখানে বড়ই কম।

প্রবাল প্রাচীরে আছড়ে ভাঙছে পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউ। প্রাচীরের দেয়াল খোলা সাগরের পানির সঙ্গে যেখানে সীমানা তৈরি করেছে, সেই জায়গাটার রঙের পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। প্রাচীরের ভেতরের অগভীর পানির রঙ কোথাও হালকা আকাশী, কোথাও সবুজ। কিন্তু বাইরে এসেই হঠাৎ করে ঘন নীল হয়ে গেছে। তারমানে ওখানে গভীরতা অনেক বেশি। অ্যাডমিরালটি চার্ট বলছে, হাজার হাজার ফুট গভীর। পানির রঙ ওপরে নীল,

যতই নিচে নামা যাবে কালচে হতে হতে একেবারে কালো হয়ে যাবে, ওখানে চিরঅন্ধকারের রাজত্ব। কল্পনা করতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের। সাগরের সেই ঘন অন্ধকার তলদেশ থেকে ঠেলে উঠেছে স্লেট রঙের প্রকাণ্ড দ্বীপটা, তাতে বাসা বেঁধেছে টকটকে লাল ফ্ল্যামিঙ্গো পাখির দল। নাহ্, পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত জায়গা! মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে।

সৈকতের কাছ থেকে বেশ খানিকটা ভেতরে দ্বীপের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ল্যাগুনটা। কেমন নিষ্প্রাণ, মরু-মরু চেহারা। একপ্রান্তে আরও দু'তিনটে খুদে-খুদে ল্যাগুন, যেন মায়ের সঙ্গে ছানারা। দ্বীপে গাছপালা খুবই কম। বেশির ভাগই রঙহীন, বিবর্ণ ঝোপ কিংবা ছোট আকারের তাল জাতীয় বৃক্ষ। ঝড়ে অঙ্গহীন, রোদে পোড়া কিছু নারকেল গাছ আছে, সৈকতের কাছেই বেশি। এসব গাছের জন্ম হয়েছে মূল ভূখণ্ড থেকে ঢেউয়ে ভেসে আসা ফল থেকে। একদিকে সৈকতের ধার ঘেঁষে গজিয়ে উঠেছে গরান গাছের ঘন জঙ্গল। এটাও ঢেউয়েরই দান, সন্দেহ নেই। এ ছাড়া আর সামান্য কিছু গাছ আছে, ছড়ানো ছিটানো। যেমন, বট। চারদিকে ডালপালা মেলে শাখা থেকে ঝুরি নামিয়ে দিয়েছে। প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে নিয়ে একেকটা গাছ নিজেই একেকটা জঙ্গল হয়ে আছে।

ওরা যেদিক থেকে এগোচ্ছে, সেদিকে কোন জনবসতি দেখা গেল না। চার্ট বলছে ম্যাথু টাউনটা রয়েছে দ্বীপের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে। এখান থেকে দেখা যায় না। অনেক ওপরে থাকলে হয়তো যেত। অ্যাডমিরালটি সেইলিং ডিরেকশন জানাচ্ছে আরও একটা জনবসতি আছে, ম্যান-অভ-ওঅর বে'তে। ধূসর পটভূমির কারণেই বোধহয় ওটাও চোখে পড়ল না। সৈকতের কিনারে ঢেউয়ের ছোঁয়ার ঠিক বাইরে পুরানো আমলের একটা স্কুনার ভেঙে পড়ে আছে, অর্ধেকটা গেঁথে রয়েছে বালিতে। দ্বীপের মরু-চেহারাটাকে যেন উস্কে দিচ্ছে আরও।

ল্যাগুনের অন্য প্রান্তে দৃষ্টি আটকে গেল কিশোরের। লাল লাল কি যেন দেখা যাচ্ছে।

'ফ্ল্যামিঙ্গো,' ওমরও দেখতে পেয়েছে।

আরও কাছে গেল বিমান। ফ্ল্যামিঙ্গোই। সংখ্যায় কত আছে ওরা, কিশোরের কল্পনারও বাইরে।

ভালমত দেখার জন্যে অনেক নিচ দিয়ে উড়ছে ওমর। বিমানের শব্দ পাখিগুলোর পছন্দ হলো না। ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করল। এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য দৃশ্য। প্রথমে কয়েকশো পাখি একটা চাদরের মত প্রায় গায়ে গায়ে লেগে উড়াল দিল। যতই এগোল, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল আরও, আরও। নীল আকাশকে ছেয়ে দিল যেন লাল রঙের চাদর। তারপর বড় বড় টুকরো হয়ে ছিঁড়তে শুরু করল চাদরটা। ছেঁড়া কাপড়ের মতই কানাগুলো বাতাসে দোল খেয়ে কেঁপে কেঁপে উড়ল কিছুক্ষণ। শেষে যেন ঝোড়ো বাতাসের ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যার যেদিকে ইচ্ছে উড়ে বেড়াতে শুরু করল। মনে হচ্ছে আগুনের খণ্ড খণ্ড শিখা ডানা

ঝাপটে ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। কেন ওগুলোকে আগুনে ফ্ল্যামিঙ্গোও বলা হয় বুঝতে অসুবিধে হলো না কিশোরের।

তাড়াতাড়ি গতি বাড়িয়ে পাখিগুলোর কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ওমর। ডানায় ধাক্কা লাগলে সর্বনাশ ঘটিয়ে ছাড়বে।

কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে মুসা আর রবিনকে ডাকল কিশোর। জানালা দিয়ে ওরাও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু ককপিট থেকে আরও ভালমত দেখা যায়। সেটা থেকে বঞ্চিত করতে চাইল না ওদেরকে।

দরজায় এসে দাঁড়াল মুসা, 'খাইছে!' ফিরে তাকিয়ে বলল রবিন, 'দেখে যাও! ওখান থেকে তো কিছুই দেখা যায় না। তা-ও আমরা ভাবছিলাম কি সাংঘাতিক!'

'এমন করে ভয় পেয়ে যাবে জানলে অত নিচে নামতামই না,' ওমরের কণ্ঠে শঙ্কা। ধাক্কা থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 'তারমানে প্লেন তেমন একটা আসে না এদিকে।'

দ্রুত ওপরে উঠছে বিমান। শেষ পাখিটাকেও ছাড়িয়ে এল। হাঁপ ছাড়ল ওমর। আর নিচে নামার চেষ্টা করল না।

পাক খেয়ে খেয়ে ধীরে ধীরে আবার মাটিতে নেমে গেল বেশির ভাগ পাখি। কিছু পাখি নামলই না। উড়তে উড়তে হারিয়ে গেল নীল দিগন্তে।

চোখে পড়ল লিটল ইনাগুয়া। মূল দ্বীপটাকে ছুঁয়ে রয়েছে। যেন বাবার আঙুল ধরে হাঁটা শুরুর ভঙ্গি করছে বাচ্চা ছেলে। ওটার পর ডান, বাম; দুদিকেই অসংখ্য ছোট ছোট উপদ্বীপ ভাঙা জিগস পাজল সৃষ্টি করে রেখেছে যেন। যত রকম আর আকৃতি কল্পনা করা যায়, সব রকমের দ্বীপ আছে। সবগুলোকে ঘিরে রেখেছে ঢেউয়ের সাদা মালা। সাগরটাকে নীল চাদর কল্পনা করে নিলে দ্বীপগুলো সব সাদা বর্ডার দেয়া রঙিন বুটি। কোনটা সবুজ, কোনটা সাদা, কোনটা স্লেট রঙের। অপূর্ব। হাঁটুর ওপর চার্ট বিছিয়ে নাম অনুসারে দ্বীপগুলোকে চিনে নেয়ার চেষ্টা চালাল কিশোর। প্রভিডেনশিয়ালিজ, অ্যামবারগ্রিস কেই, টার্কস আইল্যান্ড, ক্যাসল আইল্যান্ড···কত আর গুণবে! হাল ছেড়ে দিল শেষে।

কয়েকটা দ্বীপে অল্প পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কিছু ফ্ল্যামিঙ্গোকে। মূল দ্বীপ থেকে মাছ খেতে এসেছে সম্ভবত। ওখানে বাসা করেছে বলে মনে হলো না। এমনও হতে পারে, ওমর যেগুলোকে উড়িয়েছে, তাদেরই কয়েকটা পাখি মূল কলোনিতে ফিরে না গিয়ে ওখানে বসে পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার অপেক্ষা করছে। এই অনুমানটাই ঠিক। কারণ খানিক পরেই দেখা গেল পাখিগুলো উড়ে চলেছে গ্রেটার ইনাগুয়ার ল্যাগুনের দিকে।

কি বিশাল জায়গায় কত ক্ষুদ্র একটা জিনিস খুঁজতে বেরিয়েছে বুঝে দমে গেল কিশোর। খুদে খুদে ওসব দ্বীপে খুঁজে বেড়ানো অসম্ভব। তা ছাড়া কোনটারই আকৃতি নকশাটার মত লাগল না। কোনটাতেই হ্রদ নেই, ল্যাগুন নেই, বন নেই, একটা মূল্যবান দলিল দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখা যেতে পারে, ওরকম কোন জায়গাই নেই। যে সূত্র নিয়ে বেরিয়েছে, সেটুকু দিয়ে দলিল

খোঁজার চেষ্টাটাকেও এখন বোকামি মনে হলো ওর।

আরও একটা ঘণ্টা চক্কর দিয়ে বেড়াল ওমর। জিজ্ঞেস করল, 'কি, কিছু চোখে পড়ল?'

'কিচ্ছু না,' নিরাশায় ভরা কিশোরের কণ্ঠ।

'ইনাগুয়া ছাড়া আশেপাশে আর কোন্‌খানে কলোনি আছে, বুঝলামই না। যেখানে সেখানে বসে থাকে ওরা। জায়গার অভাবে অন্যখানে সরে গিয়ে কিছু পাখি বাসাটাসা যদি করেও থাকে, সেগুলোকে কলোনি বলা যায় না।'

'বাসার চেহারাটা কেমন, নেমে দেখা দরকার। তাহলে ওপর থেকে বুঝতে পারব, কোনটা বাসা। ওপর থেকে দেখে চেনা গেলে খোঁজা সহজ হবে।'

'আবার ইনাগুয়ার ল্যাগুনে যেতে বলছ?'

'তা ছাড়া আর বাসা কোথায় পাব?'

'তোমার কথামত আরেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা অবশ্য করা যেত, যদি পেট্রল থাকত প্রচুর। যা আছে,' কন্ট্রোল প্যানেলের মিটারের দিকে নির্দেশ করল ওমর, 'তাতে কোনমতে ফিরে যাওয়া যাবে হয়তো। নাকি সাগরে ডুবে মরার ঝুঁকিটা নিয়েই নেব?'

'নাহ্। তেল না থাকলে আর কি করা,' হতাশ ভঙ্গিতে সীটে হেলান দিল কিশোর। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ফিরেই যান।'

দুপুরের সামান্য পরে হোটেলে ফিরল ওরা। লাঞ্চের দেরি হয়ে গেল।

খিদে পেয়েছে সবারই। খাওয়ার সময় কথা বলল না। শেষ করে কফিতে চুমুক দিয়ে ওমর বলল, 'নিজের চোখেই যা দেখার দেখে এলে। এখন কারও কোন পরামর্শ আছে?'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'এভাবে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আকাশে উড়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। ভাবছি, কিংসটনে গিয়ে ফটোগ্রাফারের দোকানেই খোঁজ নেব নাকি?'

'নিলে মন্দ হয় না। হাসপাতালেও আরেকবার খোঁজ নেয়া দরকার,' রবিন বলল। 'ডেভন হয়তো আমাদের বলতে পারবেন, কোন দোকান থেকে ছবি ডেভেলপ করত হেস। তাতে দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়ানোর ঝামেলা আর সময় দুটোই বাঁচবে।'

'ঠিক বলেছ।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'কে আসবে আমার সঙ্গে?'

'তুমি রবিনকে নিয়েই যাও,' ওমর বলল। 'আমি এয়ারপোর্টে যাব প্লেনে তেল ভরতে। তারপর যাব হেসের ইয়টটা দেখতে। জেটিটাও যেহেতু বন্দরের কাছাকাছি, সুযোগ ছাড়ব কেন? এক কাজে দুই কাজ হয়ে যাবে। মুসাকে আমার দরকার।'

'ঠিক আছে, যান,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'রবিন, ওঠো।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে রওনা হলো ওরা। আগের দিনের ভাড়া-গাড়িটাতে করেই। ড্রাইভিং সীটে বসেছে রবিন। গাড়ি চালাতে

কিশোরের ভাল লাগে না। প্যাসেঞ্জার সীটে আরাম করে বসে থাকাটাই তার বেশি পছন্দ।

বিছানায় বসা অবস্থায় পাওয়া গেল ডেভনকে। তবে এখনও ফ্যাকাসে আর দুর্বল লাগছে তাঁকে। পা অনেক ফোলা। ডাক্তার বলেছেন, সেরে যাবে।

বার বার কিশোর আর ওমরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ডেভন। বললেন, ওদের কারণেই বেঁচেছেন। ওরা যদি সময়মত না যেত, সঠিক ব্যবস্থাটা নিতে না পারত, তাহলে হাসপাতালের বেডের পরিবর্তে হাসপাতালের মর্গে থাকতে হত এখন তাঁকে।

জানালেন, এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না, সাপটা কি করে এল ক্রাগেনের বাড়িতে। সাপই যে অঞ্চলে নেই, সেখানে একজনের বাড়িতে ঢুকে রেগে একেবারে টং হয়ে বসে রইল কামড়ে দেয়ার অপেক্ষায়–বিস্ময়কর লাগছে তাঁর কাছে। কোনমতেই মেলাতে পারছেন না।

এই ভয়ই করছিল কিশোর। জানত, কথাটা উঠবেই। সাপটা কোনখান থেকে এসেছে, কেন রেগে ছিল বলতে হলে হেসের গোপন কথাটা জানাতে হবে ডেভনকে। সেটা চায় না। তাই তাড়াতাড়ি চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে। ডিমটা ভেঙে যাওয়ার কথা বলল।

আফসোস শুরু করলেন ডেভন। জানেন তিনি। তাঁর হাত থেকে পড়েই ভেঙেছে। হাতে নিয়ে দেখছিলেন, এই সময় ছোবল মারে সাপটা। হাত থেকে ডিমটা পড়ে গিয়েছিল, এই পর্যন্ত মনে আছে। এরপর কি ঘটেছে, আর বলতে পারবেন না।

কিশোর তখন বলল, ডিমটা ভেঙে যাওয়াতে খুবই দুঃখ পেয়েছে ওরা। আর একটা ডিম এনে দিতে চায় ডেভনকে। কিন্তু ক্রাগেন কোনখান থেকে এনেছিল, জানে না। এমন হতে পারে পাখির বাসাসহ জায়গাটার ছবিও তুলে এনেছিল সে। সেগুলো ডেভেলপ করতে দিয়েছে। কিন্তু মারা যাওয়ায় আর নিয়ে আসার সময় পায়নি। ডেভন কি জানেন, কোন দোকানে ফটো ডেভেলপ করতে দিত ক্রাগেন?

হ্যাঁ, জানেন। বলতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন না তিনি। হেমলিন নামে অ্যাকলিম স্ট্রীটের এক কেমিস্টের দোকানে। ডেভন নিজেও তার কাছ থেকেই ছবি ডেভেলপ করান। ক্রাগেনকে তিনিই দোকানটার ঠিকানা দিয়েছিলেন। ভাল একজন কেমিস্টের খোঁজ করছিল ক্রাগেন।

এর বেশি আর জানার প্রয়োজন মনে করল না কিশোর। যতটা সম্ভব ভদ্রতা বজায় রেখে তক্ষুণি বিদায় নিল ডেভনের কাছ থেকে। রবিনকে তাড়াতাড়ি যেতে বলল অ্যাকলিম স্ট্রীটে। কিন্তু রাস্তাটা চেনে না রবিন। ট্র্যাফিক পুলিশের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া গেল।

দোকানেই পাওয়া গেল মিস্টার হেমলিনকে। সরাসরি কাজের কথায় এল কিশোর।

হেমলিন জানালেন তিনি ক্রাগেনকে চিনতেন।

'মারা যাওয়ার আগে কি কোন ছবি ডেভেলপ করতে দিয়েছিলেন মিস্টার

ক্রাগেন?' জানতে চাইল কিশোর।

মাথা নাড়লেন হেমলিন। 'নাহ্। বেশ কিছুদিন দেননি।'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল কিশোর। 'ছবি ডেভেলপের কাজটা কি আপনি নিজে করেন?'

'হ্যাঁ। কর্মচারীদের ওপর আমার বিশ্বাস নেই।'

'তারমানে ছবির সমস্ত প্রিন্টই আপনি দেখেন। মিস্টার ক্রাগেনের এনে দেয়া ফ্ল্যামিঙ্গো কিংবা কোন দ্বীপের ছবি কখনও ডেভেলপ করেছেন?'

আবার মাথা নাড়লেন হেমলিন। 'নাহ্···মনে পড়ছে না।'

'ও। বিরক্ত করলাম আপনাকে। থ্যাংক ইউ।'

হতাশ হয়ে ঘুরতে যাবে কিশোর, ওর কালো মুখ দেখেই বোধহয় ডাকলেন হেমলিন, 'শোনো, বাসায় বসা ফ্ল্যামিঙ্গোর ছবি কি তোমার বেশি দরকার? তাহলে কার কাছে পাবে বলে দিতে পারি।'

'কার কাছে?' উত্তেজনাটা চেপে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল কিশোর।

'দু'তিন দিন আগে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন নেগেটিভের একটা স্পুল নিয়ে। খুব ভাল উঠেছে ছবিগুলো।'

'কপি আছে আপনার কাছে?'

'না, আমি কপি রাখি না। অন্যের জিনিস দিয়ে ব্যবসা করার আগ্রহ আমার নেই। নেগেটিভও ফেরত দিয়ে দিই।'

'নাম কি ভদ্রলোকের?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে কিশোর। 'ঠিকানা জানেন?'

'এক মিনিট।' খুব ধীরে সুস্থে অর্ডার বুকটা টেনে নিলেন হেমলিন। আঙুল রেখে রেখে লিস্টে খুঁজতে লাগলেন নামটা। 'এই যে, পাওয়া গেছে। মিস্টার ডুগান। ম্যাইসন রেসপিরোতে উঠেছেন। ছবিগুলো কি করে পেলেন তিনি বলতে পারব না···'

আর কিছু শুনতে চাইল না কিশোর। যা জানার জেনে গেছে। কোনমতে সৌজন্য দেখিয়ে হেমলিনকে একটা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

'শুনলে তো?' তিক্তকণ্ঠে রবিনকে বলল সে। 'ডুগান নিয়ে গেছে। দ্বীপ খুঁজে বের করতে ওর আর কোন কষ্টই হবে না। ছবি থাকলে আর কি চাই?'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'সাংঘাতিক চালাক লোক।'

'আসল কথা, আমাদের আগেই গিয়ে বসেছিল বলে ক্যামেরা হাতানোর সুযোগটা পেয়ে গেছে। ওমরভাইকে জানানো দরকার। ডুগান কোথায় আছে, জানি আমরা। তাড়াতাড়ি করলে হয়তো এখনও ধরা যাবে তাকে।'

'আমরা তাড়াহুড়ো করলে কি হবে? ওমরভাই যে কাজে গেছেন, তাতে সময় লাগবে। এক কাজ করা যায়। হোটেলে না গিয়ে প্রথমে এয়ারপোর্টে, তারপর বন্দরে গিয়ে দেখতে পারি।'

'উঁহু,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'গিয়ে দেখা গেল নেই ওরা। আমরা যাওয়ার আগেই হোটেলে রওনা হয়ে গেছে। তাহলে আরও বেশি দেরি হবে। তারচেয়ে হোটেলেই যাই। অপেক্ষা করব।'

কিন্তু রবিনের অনুমান ঠিক হলো না। হোটেলে ফিরে দেখা গেল ওমর আর মুসা অনেক আগেই এসে বসে আছে। কিশোরকে উত্তেজিত দেখে ওমর ভাবল, ছবিগুলোর খোঁজ পাওয়া গেছে।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন? ইয়ট দেখা হয়ে গেল?'

'দেখব কোত্থেকে?'

'কেন?'

'বন্দরে নেই ওটা।'

তাকিয়ে রইল কিশোর।

'আমরা তো চিনি না,' রুক্ষস্বরে বলল ওমর, 'পুলিশ হেডকোয়ার্টারে গিয়ে সাহায্য চাইলাম। বললাম জাহাজটাকে চেনে এমন একজন লোক দিতে। দিল। তাকে নিয়ে বন্দরে গিয়ে দেখি ওটা নেই। তখন খোঁজ পড়ল। এর আগে কেউ খোঁজও করেনি, বন্দর কর্তৃপক্ষেরও গোচরে আসেনি যে ইয়টটা খোয়া গেছে। মালিক নেই, খোঁজ করবে কে? তদন্তে আরও কাহিনী বেরিয়ে এল। বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের জানাল, কাল রাতে একজন জেলে নাকি তার নৌকা চুরি গেছে বলে অভিযোগ করেছে। পরে পাওয়া গেছে নৌকাটা। তীর থেকে কিছুটা দূরে ভাসছিল। কোন সন্দেহ নেই ওটাতে চড়েই ইয়টে গিয়ে উঠেছিল চোর, তারপর নৌকাটা ছেড়ে দিয়েছে।...তা তোমাদের খবর কি?'

'আপনাদের চেয়ে খারাপ,' নাকমুখ কুঁচকে বলল কিশোর। 'ব্রন ডুগান ছবিগুলো নিয়ে গেছে। ক্রাগেনের নেগেটিভ ডেভেলপ করতে দিয়েছিল। তারপর ছবি আর নেগেটিভ সব নিয়ে গেছে। একটা কপিও রাখেনি দোকানে।'

সিগারেট বের করে ধরাল ওমর। 'হুঁ, সবকিছু এখন পরিষ্কার। ডেভনের কাছে পাখির কথা জেনে গিয়ে ক্রাগেনের বাড়ি থেকে ক্যামেরা আর স্পুল চুরি করেছে ডুগান। ডেভেলপ করেছে। আসল সূত্র যা পাওয়ার পেয়ে গেছে সে।'

'ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া উচিত এখন সেগুলো!' রেগে গেল রবিন।

'পাবে কোথায়?' শুকনো হাসি হাসল ওমর। 'ইয়টটা নেই কেন বুঝতে পারছ না?'

'আপনার ধারণা,' ভুরু কোঁচকাল রবিন, 'ও-ই চুরি করেছে?'

'তো আর কে? ইয়টটা না পেয়ে পুলিশকে বললাম ম্যাইসন রেসপিরোতে খোঁজ নিতে। জানা গেল, কাল রাতে দুজন গেস্ট হোটেল ছেড়ে চলে গেছে। একজন ব্রন ডুগান, আরেকজনের নাম ডক্টর রৎসি ব্রোমানভ, ইয়োরোপিয়ান। এখানকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে এসেছেন। আহা, কি আমার প্রফেসর! চোরের সাগরেদ বাটপাড়! শিওর ওই নকল ডুগানটা, সুইমিং পুলের কাছে যাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। কোন যাত্রীবাহী জাহাজে চড়েনি ওরা। কাল রাতে অন্য কোন জাহাজও ঘাট ছেড়ে যায়নি। প্লেনে করেও যায়নি ওরা। কারণ শেষ যে প্লেনটা ছেড়ে গেছে, যখন গেছে তারও অনেক পরে হোটেল ছেড়েছে দুই ডুগান, আসল আর নকল। এরপরও কি অনুমান করতে

কষ্ট হয়, রোগ এখন কোন্ ব্যাটাদের দখলে?'

ছয়

রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করল ওরা। ইয়টটাকে খুঁজে বের করতে হবে আগে। ওটার পিছু নিলে পৌঁছে যেতে পারবে হেসের দ্বীপে। বিমান নিয়ে আকাশ থেকে দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এ কথাটা ডুগানও নিশ্চয় চিন্তা করবে। খোলা সমুদ্রে থাকতে চাইবে না দিনের বেলা। তা ছাড়া চল্লিশ ঘণ্টা আগে রওনা দিয়েছে। দ্বীপটা কাছাকাছি হলে ওরা পিছু নেয়ার আগেই গন্তব্যে পৌঁছে লুকিয়ে পড়তে পারবে–যদি দ্বীপে ইয়ট লুকানোর জায়গা থেকে থাকে।

'একটা কথা মাথায় ঢুকছে না,' মুসা বলল, 'ডুগান জানে আমরা আছি এখানে। তারপরেও ইয়টটা চুরি করল কেন? আমরা সব বুঝে ফেলে ওর পিছু নেব, জানে না?'

'জানে,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আর কি করবে? জাহাজ ভাড়া করতে প্রচুর টাকা লাগে। টাকা হয়তো ম্যানেজ করতে পারত। কিন্তু আসল সমস্যা হলো, ভাড়া করা জাহাজের নাবিকেরা চোখ বন্ধ করে থাকবে না। ডুগান কি করছে দেখবে। প্রশ্ন করবে। ভুলে যেয়ো না, এসব দ্বীপ এককালে জলদস্যুতে গিজগিজ করত। গুপ্তধনের গুজব যখন তখন ছড়ায়। কোন নির্জন দ্বীপে ডুগানকে নেমে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখলেই সন্দেহ করে বসবে ওরা। ঝামেলা বাধাবে। তারচেয়ে ইয়টটা চুরি করে চলে যাওয়া অনেক সহজ। তাতে শুধু আমরা পিছে লাগব, দ্বীপসুদ্ধ সমস্ত মানুষ তো আর লাগবে না। খবরটা ছড়িয়ে পড়লে আশেপাশের দ্বীপ থেকেও নৌকা নিয়ে ছুটে আসবে গুপ্তধন শিকারিরা।'

'প্লেনের এঞ্জিনের শব্দে সাবধান হয়ে যেতে পারে সে,' রবিন বলল।

'কিছু করার নেই। তবে এটাও ঠিক, আমাদেরটাই একমাত্র এরোপ্লেন নয়। আরও প্রচুর আছে। সাগরের ওপর দিয়েই পথ। তা ছাড়া সে জানে না আমাদেরটা কোন্ ধরনের প্লেন। সতর্ক থাকবে ঠিকই, তবে দেখলেও চিনতে পারবে না।'

সুতরাং পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে পড়ল ওরা। সারাদিন খুঁজে বেড়াল। খোঁজার জিনিস এখন দুটো: হেসের ইয়ট, আর ফ্ল্যামিঙ্গোদের নতুন কলোনি।

দুঃখের বিষয়, কোনটাই পেল না।

তার পরদিন খুব সকালে আবার বেরোল। ইনাগুয়ার চারপাশে দেড়শো মাইলের মধ্যে সমস্ত এলাকা চষে ফেলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল ওমর। তার উদ্বেগ আরও বাড়ানোর জন্যেই যেন আবহাওয়ারও অবনতি ঘটল। আগের রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়েছিল। ওরা যখন দিনের বেলা বেরিয়েছে, মাঝে মাঝেই খারাপ হয়েছে আকাশ। বিদ্যুৎঝড়ের কারণে

কয়েকবার গতিপথ থেকে সরে যেতে হয়েছে ওমরকে। দক্ষিণ থেকে আসা মেঘ প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি ঢেলেছে সাগরের বুকে।

'কি করব এখন বুঝতে পারছি না,' লাঞ্চের সময় বলল ওমর।

'একটা কথা চিন্তা করছি আমি,' কিশোর বলল। 'সকালে ঘোরার সময় মাথায় এসেছে। ইনাগুয়ার ল্যাগুনটার আকৃতি বদলে গেছে, লক্ষ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ওমর, 'করেছি।'

'কাছাকাছি আরও কিছু জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে।'

মুখ তুলে তাকাল ওমর। 'কোনটাকে নকশাটার মত মনে হয়েছে?'

'সাগরের কিনার ঘেঁষে একটাকে কিছুটা ওরকম লেগেছে। তবে ওসব জলাশয়ের কথা ভাবছি না আমি। ওগুলো সাময়িক। বৃষ্টি পড়লে হয়, শুকিয়ে গেলে শেষ। আমি ভাবছি, পানি বেড়ে কিংবা কমে গেলে কোন একটা বিশেষ ল্যাগুনের চেহারা নকশাটার মত হয়ে যায় না তো?'

'তারমানে আবার যেতে হবে ইনাগুয়ায়,' উত্তেজিত হয়ে বলল রবিন।

'যাওয়াটাই তো উচিত মনে হচ্ছে,' মাথা দোলাল ওমর। 'আজকে তো আর সময় নেই, আকাশের অবস্থাও সুবিধের না। কাল সকালে যাব।'

'ডুগান ওখানেই গিয়ে থাকলে দেখে ফেলবে আমাদের,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'ভালই তো হবে,' কিশোর বলল। 'আমরা তো ওকে খুঁজছিই। যদি দেখি ওখানে আছে, শিওর হয়ে যাব ওইটাই হেসের দ্বীপ।'

'ধরা যাক, সঠিক ল্যাগুনটা পাওয়া গেল, ইয়টটাও দেখতে পেলাম, কি করব?'

'আকাশ থেকে কিছুই করতে পারব না,' জবাব দিল ওমর। 'করতে হলে নামতে হবে। প্রথমে ডিম্বাকৃতির ল্যাগুনের পাশে বর্গাকার চিহ্ন দেয়া জায়গাটা খুঁজব। ওটা কিজন্যে দিয়েছে হেস, জানি না। তবে কোন কারণ নিশ্চয় আছে, নইলে দিত না। কালকে খাবার আর পানি নিয়ে যাব সঙ্গে করে, নামতে হলে ওসব লাগবে। পকেট কম্পাস নিতে হবে সবাইকে। ছড়িয়ে গিয়ে খোঁজার প্রয়োজন পড়তে পারে। ওপর থেকে দ্বীপটাকে সমতল মনে হলেও খানাখন্দ, ঝোপঝাপ নিশ্চয় আছে। রাস্তাঘাটও নেই তেমন।'

ম্যাপ বের করে টেবিলে বিছাল সে।

'কোন্ জায়গায় নামলে সুবিধে হবে মনে করেন?' ম্যাপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'সেটা ওখানে না গিয়ে বোঝা যাবে না। ম্যাপ দেখে কিছু বলতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সার্ভে হয়েছে বহু আগে। এতদিনে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। বৃষ্টি হলেই যেখানে ল্যাগুনের চেহারা পাল্টে যায়, সেখানে ম্যাপের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা কোনমতেই উচিত নয়।'

'ল্যাগুনে নামা যায় না?' কিশোরের প্রশ্ন। 'অনেক বড়। পানিও আছে।'

'যায়, তবে ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। পানি কোনখানে কতটা গভীর, জানি

না। নিচে পাথর থাকতে পারে। চোখা পাথরে লেগে প্লেনের পেট চিরে গেলে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে। তা ছাড়া জায়গাটা অতিরিক্ত খোলা। ডুগানের চোখে পড়ে যাব। যে রকম জায়গা, আমাদের খুন করে যদি প্লেনটা পুড়িয়ে ফেলে, পোড়া ছাই ডুবিয়ে দেয় ল্যাগুনের পানিতে, কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। ভাল কথা, কাল সঙ্গে করে পিস্তলও নিয়ে যেতে হবে আমাদের। ডুগান একা যায়নি। তার নকল দোস্ত আছে, ফ্রিক সায়াকেও নিশ্চয় নিয়েছে। এ ছাড়াও আরও লোক নিতে পারে। তারা কেউই যে ফেরেশতা হবে না, এ ব্যাপারে গ্যারান্টি দেয়া যায়।'

বাকি বিকেল আর সন্ধেটা আলোচনা করেই কাটল। রাতে সকাল সকাল ঘুমাতে গেল ওরা। পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে উড়ল প্লেন নিয়ে।

আটটা নাগাদ দিগন্তে ফুটে উঠল ইনাগুয়ার চেহারা। প্রকাণ্ড এক জলজন্তুর মত গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে আছে যেন পানিতে ভেসে।

সবাই উত্তেজিত। কিশোরের অনুমান ঠিক হয় কিনা দেখতে আগ্রহী। ল্যাগুনের ওপর এসে চক্কর দিয়ে দিয়ে উড়তে লাগল ওমর। বেশি নিচে নামল না। সাবধান রইল পাখিগুলোর ব্যাপারে। যাতে ভড়কে গিয়ে আগেরবারের মত উড়তে শুরু না করে।

মূল ল্যাগুনটা মোটেও হেসের আঁকা নকশার মত মনে হলো না। তবে সাগরের ধার ঘেঁষে যে তিনটে উপল্যাগুন আছে, তার একটাকে মনে হলো ওরকম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চিৎকার দিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে, দেখুন ওটা! নকশাটার মত লাগছে না?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ওমর। চুপচাপ দেখল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ। দাঁড়াও, আরও কাছে থেকে দেখি।'

উপল্যাগুনটার ওপর উড়তে উড়তে বলল সে, 'দেখো, কাছাকাছিই আছে অনেকগুলো পাখির বাসা। একটা ডিম তুলে নিয়ে যেতে কোন অসুবিধেই হয়নি হেসের।'

'আরও একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমি,' উত্তেজনায় গলা চড়ে গেল কিশোরের। 'ল্যাগুনটার একধারে দেখুন কেমন ফোঁড়ার মত উঁচু হয়ে আছে। নকশায় আঁকা বর্গটার সঙ্গে মিলে যায় না? এত ওপর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ওটা কি। আরও নিচে নামান।'

হাসি ফুটল ওমরের মুখে। 'মনে হচ্ছে এতদিনে কষ্ট সার্থক হতে চলেছে। কাউকে দেখছিও তো না। পাখিগুলোও চুপচাপ। তারমানে কেউ কাছে যায়নি এখনও।'

'কিন্তু ইয়টটা কোথায়?' পানির কিনারায় যতদূর চোখ যায়, দেখতে লাগল কিশোর।

'ওদিকে আছে নাকি দেখি,' বলে উপকূলের দিকে নাক ঘুরিয়ে দিল ওমর।

তীর বরাবর উড়ে পুরো দ্বীপ চক্কর দিয়ে এসেও জাহাজটা চোখে পড়ল

না। ঘণ্টাখানেক লাগল তাতে। ছোট, বড়, মাঝারি, কোন ধরনের জলযানই চোখে পড়ল না।

'ইয়ট লুকানোর সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা এখানে ওই গরান গাছের জঙ্গল,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বনটার দিকে তাকাতে লাগল ওমর। 'দেখতে হলে নিচে নামতে হবে। আকাশ থেকে চোখে পড়বে না।'

'হ্যাঁ, নামতেই যখন হবে,' কিশোর বলল। 'দেরি করে লাভ নেই।'

'নামার জায়গাই খুঁজছি। ল্যাগুন থেকে বেশি দূরে হওয়া চলবে না। আবার জঙ্গলও যাতে দূরে না পড়ে।'

সেরকম জায়গা খুঁজে বের করা গেল। জঙ্গল আর ল্যাগুন থেকে প্রায় সমদূরত্বে, একটা খাঁড়ি। ওপর থেকে পানির রঙ দেখেই বোঝা যায় যথেষ্ট গভীর, ডুবোচড়া কিংবা টিলা নেই। ঢেউও খুব কম, সাদা ফেনার অনুপস্থিতিই তার প্রমাণ।

ম্যাপ থেকে মুখ তুলে বলল কিশোর, 'এটাই ম্যান-অভ-ওঅর বে।'

ওটা থেকে হাঁটাপথে জঙ্গলটাও চার মাইল দূরে, ডিম্বাকৃতির ল্যাগুনটাও। জঙ্গলের আরও কাছাকাছি নামা যায়, কিন্তু শত্রুরা থেকে থাকলে তাদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দূরে থাকাই ভাল। তবে ল্যাগুনের আরও কাছাকাছি নামার সুবিধে থাকলে, নামা যেত। নেই। সাগর ওখান থেকে আধমাইলও হবে না। উপকূল রক্ষা করছে প্রবাল প্রাচীরের বেড়া। ভেতর দিকে বিমান নামানো নিরাপদ নয়, ডুবোটিলা থাকার সম্ভাবনা ষোলোআনা। বাইরের দিকে সাগর ভীষণ অশান্ত। একমাত্র নিরাপদ জায়গা ওই খাঁড়িটাই।

নিচে নামতে শুরু করল ওমর। পানি ছোঁয়ার আগে শেষবারের মত ভাল করে দেখে নিল চোখা পাথরের চাঙড় কিংবা টিলা আছে কিনা। তারপর সহজেই নামিয়ে আনল বিমান। দৌড় শেষ করে থেমে গেল ওটা। আলতো ঢেউয়ে দুলতে লাগল মৃদু মৃদু। বাতাস নেই। রোদের তেজ বোঝা গেল তাই।

সবাইকে এক জায়গায় জড় করল ওমর। ওর প্ল্যান বুঝিয়ে বলতে গিয়ে ছোটখাট একটা লেকচার দিয়ে দিল, 'আমার বিশ্বাস, হেসের দ্বীপ এটাই। ডেভনকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে, পাখি আর ডিমের লোভ সামলাতে না পেরে যদি তিনি বেরিয়ে পড়তে চান, সেকারণে তাঁকে ঠেকানোর জন্যে মিথ্যে বলেছিল সে। আশেপাশে নির্জন দ্বীপ প্রচুর থাকলেও ফ্ল্যামিঙ্গোদের তৃতীয় কোন কলোনি নেই।

'যাই হোক, দুই জায়গায় দেখতে যেতে হবে এখন আমাদের। একটা ওই গরান গাছে জঙ্গল, আরেকটা ল্যাগুন। ইয়টটা এসে থাকলে, ওই জঙ্গলেই ঢুকে বসে আছে। ডুগানের আগেই ফর্মূলাটা বের করে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কেটে পড়তে হবে আমাদের। একই জায়গায় একসঙ্গে সবার যাওয়ার দরকার নেই, তাতে সময় নষ্ট। প্লেন পাহারা দেয়ার জন্যেও থাকতে হবে একজনকে। ফিরে এসে যদি দেখি নোঙর খুলে সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে আসা হয়েছে, কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, মোটেও সুখকর হবে না সেটা। ডুগানকে দিয়ে সবই সম্ভব। আমি ভাবছি. প্লেনটা আমিই পাহারা দেব। তোমরা দই ভাগ

হয়ে দুটো জায়গায় চলে যাও। জঙ্গলে ইয়ট খুঁজতে ঝামেলা বেশি হওয়ার কথা, তাই দুজন যাও সেদিকে। অন্য একজন যাও ল্যাগুনের পাশের উঁচু জায়গাটায় কি আছে দেখতে। সময় খুব বেশি লাগার কথা নয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে সবাই। কে কোথায় যাবে, তোমরাই ঠিক করো। কোন প্রশ্ন আছে?'

'ফ্ল্যামিঙ্গোগুলোকে কাছে থেকে দেখার ইচ্ছে আমার,' কিশোর বলল।

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল ওমর, 'তাহলে তোমরা দুজন জঙ্গলে যাও। মনে মনে আমিও তোমাদেরকে পাঠানোর কথাই ভাবছিলাম। গুপ্তধন খুঁজে বের করায় কিশোরই বেশি এক্সপার্ট।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'তোমাকে কিন্তু একা যেতে হবে।'

'কোন অসুবিধে নেই।'

'বেশ। সঙ্গে করে পানির বোতল নিয়ে যাও। কিছু বিস্কুটও নিতে পারো। মনে রাখবে, তিন ঘণ্টা। পাঁচ ঘণ্টা পরও কেউ না ফিরলে বুঝতে হবে সে বিপদে পড়েছে। তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলো?'

তিনজনেই চুপ করে রইল। কারও কোন প্রশ্ন নেই।

'বেশ,' ওমর বলল, 'তাহলে এইই ঠিক হলো। প্লেনটা তীরের আরও কাছে নিয়ে যাচ্ছি যাতে শুকনোর মধ্যে নামতে পারো।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আর, পিস্তল অবশ্যই নেবে সঙ্গে। ডুগান আর তার দোস্তদের কোন বিশ্বাস নেই!'

সাত

সোজা পুবদিকে হাঁটতে লাগল কিশোর। উঁচু জায়গাটা কি, ঢিবি না অন্য কিছু সেটা ভেবে সময় নষ্ট করল না। গেলেই দেখতে পাবে। বরং ভাবতে লাগল কোনদিক দিয়ে গেলে সহজে যাওয়া যায়।

দুটো পথ। একটা সরাসরি, আরেকটা উপকূল বরাবর, ঘুরে। অহেতুক ঘুরতে যাওয়ার কোন মানে নেই। শর্টকাটটাই বেছে নিল। কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পরই বুঝল, ঘুরেই যাওয়া উচিত ছিল। আকাশ থেকে যে জায়গাটাকে চ্যাপ্টা, সমতল মনে হয়েছে সেখানে দেখা গেল প্রচুর বাধা। আপতত সামনে পড়ল তরাই অঞ্চল।

সময় বেঁধে দিয়েছে ওমর। তরাই ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল সে, তিন ঘণ্টায় চার মাইল গিয়ে ফিরে আসা কি সম্ভব? বেশিক্ষণ মাথা ঘামাল না এটা নিয়ে। দু'এক ঘণ্টা বেশি যদি লাগেই তো লাগুক। সঙ্গে পানিও আছে, খাবারও আছে। পানি আনাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে। যা গরমের গরম, তার ওপর নেই বাতাস, পানি ছাড়া বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না।

কিছুদূর এগিয়ে একটা পায়ে চলা পথ দেখতে পেল। পুরানো না নতুন বোঝা না গেলেও এটা বোঝা গেল, মানুষে তৈরি করেনি। পথটা এগিয়ে গেছে

কাঁটাঝোপের দিকে।

সেই পথ ধরে আরও কিছুদূর এগোনোর পর পাওয়া গেল একটা পরিত্যক্ত গ্রাম। অবাক হলো। এখানে এরকম একটা গ্রাম থাকবে, আশা করেনি। আদিম কোরাল, পাতা আর কাঠে তৈরি পুরানো কুঁড়েগুলো পড়ে আছে নির্জন, নিঃসঙ্গ। যেন মৃত্যু আর ধ্বংসের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কয়েকটা কুড়ে কোনমতে টিকে রয়েছে, চালাটা খাড়া রেখে দাঁড়িয়ে আছে নড়বড়ে অবস্থায়, বাকি সব ধসে পড়েছে। জানালার পাল্লা নেই। দূর থেকে দেখে মনে হয় দেয়াল থেকে তাকিয়ে রয়েছে ওগুলো একচোখো অন্ধ মানুষের মত। দরজা-জানালার পাল্লাও জায়গামত নেই। ভাঙা, মরচে ধরা কব্জা থেকে ঝুলে আছে কাত হয়ে। একটা গির্জাও দেখা গেল। বেদি দেখে বোঝা গেল যে ওটা গির্জা ছিল। ওটার কাছে মাটির ছোট ছোট ঢিপি দেখা গেল অনেকগুলো। পুরানো কবর। কোন কোনটার মাথার কাছে ক্রুশ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল সেগুলো। ঝুরঝুরে হয়ে এসেছে। বাকিগুলোর মতই ধসে পড়ে মাটিতে মিশে যাবে একদিন।

ম্যাপে দেখা ম্যান-অভ-ওঅরের কাছের জনবসতি বোধহয় এটাই। এভাবে বাড়িঘর ফেলে কেন চলে গেছে মানুষগুলো, কে জানে। মহামারী লেগেছিল হয়তো। কবরগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি হলো ওর। বিষণ্ন, ভয়াবহ পরিবেশ, যেন মনে করিয়ে দেয় বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই; এটাই হবে তোমার শেষ পরিণতি!

গাঁয়ের শেষ বাড়িটার কাছে এসে দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়াল ও, জিরানোর জন্যে। একচোখো জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। ফোকর দিয়ে রোদ ঢুকে অন্ধকার ঘরের মেঝেতে বিচিত্র সাদা আল্পনা তৈরি করেছে। মাকড়সার জালের ছড়াছড়ি। এককোণে বড় একটা মাকড়সাকে স্থির হয়ে ঝুলে থাকতে দেখল। যতই মরে থাকার ভান করুক, কিশোর জানে, জালে পোকা পড়ামাত্র সচল হয়ে উঠবে ওটা, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

মিনিটখানেকের বেশি দাঁড়াল না সে। সময় নেই। গ্রাম ছাড়ানোর পর কোথাও ছায়া দেখল না। গরম! প্রচণ্ড গরম! নিষ্ঠুর আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন চামড়ার ওপর। রুমাল দিয়ে ক্রমাগত ঘাড় মুছেও ঘামের কোন কিনারা করতে পারল না সে।

সামনে ঘাসে ঢাকা জমি। তৃণভূমির এমন রূপ জীবনে দেখেনি সে। সবুজ তো নেইই, রুক্ষ, বিবর্ণ। মাইলখানেক ধরে বিছিয়ে থাকা খসখসে ঘাসের রঙ বাদামী, মাঝে মাঝে কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। দু'একটা গাছ আছে এখানে ওখানে, ঘাসের মতই প্রাণহীন, বিধ্বস্ত চেহারা। ডাল থেকে ঝুলে থাকা পাতাগুলো ধাতুর মত চকচকে। লক্ষ করল, প্রায় প্রতিটি জিনিসই চকচক করছে। কারণটা বুঝতে পারল শুকনো পানির গর্তগুলো পরীক্ষা করে। নিচে কাদা নেই, লবণ জমে আছে। লবণের কণা ছড়িয়ে আছে সবখানে। প্রবল ঝড়ের সময় জলোচ্ছ্বাস কিংবা বাতাসে বয়ে আনা পানির কণার সঙ্গে চলে

আসে এই লবণ। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, ইনাগুয়াও প্রায় মরুদ্বীপ। দূরে চোখে পড়ছে কতগুলো নারকেল গাছ। অন্য গাছগুলোর মতই মরা মরা চেহারা। তৃণভূমির অন্য প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে নানা ধরনের উঁচু-উঁচু কাঁটাঝোপ। বিশাল ক্যাকটাস আছে। পুরো এলাকাটায় কেবল ওগুলোর ফুলই উজ্জ্বল বর্ণের, ঝলমলে রঙ।

ঝোপ আর ক্যাকটাস বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সামনে। এড়ানোর জন্যে অনেকটা ঘুরে এগোতে হচ্ছে ওকে।

মজার ব্যাপার হলো, এত রুক্ষ অঞ্চলেও বুনো প্রাণীর অভাব নেই। পেলিকান, গ্রেবিস আর নানা জাতের বক দাঁড়িয়ে আছে থকথকে কাদায় ভরা পানির গর্তগুলোতে। কয়েক ধরনের গিরগিটি আর অগুণতি কাঁকড়া দেখা গেল। এই কাঁকড়াগুলো মূলত ডাঙার বাসিন্দা, তবে পানিও এদের পছন্দ। বড় বড় হলুদ চোখে শয়তানি ভরা চাহনি। সবাই ব্যস্ত। মাটি খুঁড়ে গর্ত বানাচ্ছে। ভীষণ তাড়াহুড়া যেন সবার মধ্যে। চট করে আকাশের দিকে চোখ চলে গেল কিশোরের। ঝড়বৃষ্টি আসছে নাকি? প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখলেই এ ধরনের ডাঙার কাঁকড়ারা ঘর বানাতে ব্যস্ত হয়। কিন্তু ঝকঝকে আকাশে সূর্যকে আগুন ঢালতে দেখে বোঝার কোনই উপায় নেই, ঝড় হবে কিনা।

পাশ কাটানোর সময় হুমকির ভঙ্গিতে দাঁড়া উঁচু করে ওকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল কাঁকড়ারা। আশেপাশে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ মরা কাঁকড়ার খোসা। এলাকাটাকে ভয়ঙ্কর রূপ দিয়েছে। যেন এক ভয়াবহ মহাশ্মশান।

মাড়িয়ে যাওয়ার সময় পায়ের চাপে মচমচ করে ভাঙছে কাঁকড়ার খোসা। শব্দটা ভাল লাগল না মোটেও। যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করল।

প্রতিটি গাছেই কাঁটা। চলার সময় ডালপাতা বাড়ি লাগে গায়ে, পুটপুট করে কাঁটা ফোটে। থেমে যেতে হয় তখন গায়ে বেঁধা কাঁটা বের করার জন্যে।

সমস্যা আরও আছে। লবণ মেশানো আঠাল থকথকে সাদা কাদা। পা ফেললেই জুতো কামড়ে ধরে। তার ওপর রয়েছে মশা। রোদের মধ্যেও এসে ছেঁকে ধরছে। ওগুলোর মিলিত গুঞ্জন শুনে মনে হয় দূর থেকে প্লেন আসছে, এতটাই জোরাল। চোখ, নাক, কান, হাত যেখানেই সামান্যতম খোলা পাচ্ছে, এসে বসে যাচ্ছে। রুমাল দিয়ে বাড়ি মেরে তাড়ানোর চেষ্টা করছে সে। বৃথা চেষ্টা। একশোটা সরলে হাজারটা এসে ধরে।

কম্পাস বের করে দেখে নিল ঠিকপথে এগোচ্ছে কিনা। এগোতে এগোতে সামনে একটা বটগাছ দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রায় একরখানেক জায়গা জুড়ে ছায়া দিয়ে রেখেছে।

কিন্তু দেরি হয়ে যাওয়ার ভয়ে বেশিক্ষণ আরাম করার সাহস পেল না। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়েই উঠে পড়ল। বোতল থেকে পানি খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল।

যতই এগোচ্ছে, সামনে আরও খারাপ হচ্ছে রাস্তা। বাড়ছে কাঁটঝোপের পরিমাণ। ঘনও হচ্ছে। ভয় পেয়ে গেল, এর ভেতর দিয়ে এগোবে কি করে!

শুকনো একটা শিকড়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে হাতের তালুতে কাঁটা ফোটাল বেশ কয়েকটা। বের করতে কষ্ট হলো খুব।

আরও কিছুদূর এগিয়ে পৌঁছল এমন এক জায়গায়, যেখানে চুনাপাথরের ছড়াছড়ি। ধূসর রঙের পাথরগুলো কাঁচের মত চকচকে। রোদ প্রতিফলিত করে ফেলছে চোখেমুখে। ফোস্কা পড়ে যাওয়ার উপক্রম। একপাশে খানিক দূরে একটা ছোট পাহাড়। গা দেখে অবাক হয়ে গেল সে। স্পঞ্জের মত ছিদ্র হয়ে আছে। লক্ষ লক্ষ শামুকের খোসা আর নানা রকম সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল রোদে দগ্ধ হচ্ছে। চুনাপাথরে পরিণত হতে সময় লাগবে না। হয়েও গেছে কিছু কিছু। ওই পাহাড়টা একসময় পানির নিচে ছিল এবং সেটা খুব বেশিদিন আগে নয়, বোঝা যায় দেখলেই। সাগর যেখানে রয়েছে এখন, তাতে পানি বেড়ে গিয়ে ওই পাহাড়কে ডুবিয়ে দিতে পারে আবার যে কোনদিন।

শর্টকাটের লোভে পাহাড় ডিঙানোর চেষ্টা করল না সে। চকমকির মত শক্ত, ধারাল পাথরের ঢাল। কোন কারণে পা পিছলে আছাড় খেলে হাত-পা ভাঙা থেকে যদিও বা রেহাই পায়, কত জায়গায় যে কাটবে ঠিকঠিকানা নেই। অতএব কাঁটা ফোটানোটাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে আবার ঘুরে দাঁড়াল ঝোপগুলোর দিকে।

কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর মোটা কয়েকটা ডাল ব্যারিকেড সৃষ্টি করে পথ একেবারে বন্ধ করে দিল। এত কষ্ট করে এসে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবতে পারল না সে। মরিয়া হয়ে এগোনোর পথ খুঁজতে শুরু করল।

শুরুর দিকে যে ধরনের পায়ে চলা পথ দেখতে পেয়েছিল, ওরকম একটা সরু রাস্তা দেখতে পেল ঝোপের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল কিসে করেছে ওই পথ? কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে কারা চলাচল করে?

কিন্তু বেশি ভাবনাচিন্তার সময় নেই। ঢুকে পড়ল তাতে। কাঁটা, লবণাক্ত কাদা, আর ধারাল পাথরে লেগে লেগে জুতোর যা অবস্থা হয়েছে, আর বেশিক্ষণ টিকবে না। জুতো ছিঁড়ে গেলে কিংবা তলা খসে গেলে যে কি বিপদে পড়বে, ভাবতে চাইল না আর।

হাঁটতে হাঁটতেই একটা বিস্কুট চিবাতে লাগল। দাঁড়িয়ে খাওয়ার সময় নেই। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে। তিন মাইল পেরিয়েছে। হিসেব মত আরও মাইলখানেক রয়ে গেছে। এই হারে চললেও এক ঘণ্টার ধাক্কা।

ঝোপের ভেতর দিয়ে কিছুদূর এগোতেই কিসে পথ করেছে সেই রহস্যের জবাব পেয়ে গেল। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেল বাদামী রঙের নোংরা কাদামাখা এক মাদী শুয়োরের সঙ্গে। সঙ্গে কয়েকটা বাচ্চা। ওকে দেখে ভয় পেয়ে তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে এদিক ওদিক ছুটে পালাল ছানাগুলো। কোথাও স্বস্তি না পেয়ে আবার ফিরে এল মায়ের কাছে। পেছনে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে কুতকুতে চোখে তাকাতে লাগল অযাচিত উপদ্রবের দিকে।

ধাড়ি শুয়োরটা খুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁত দেখাল। পিস্তল বের করে ফেলল কিশোর। পেছনে দৌড় দিলে রক্ষা নেই। যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। চোখের দৃষ্টি দিয়ে একে অন্যকে পরাজিত

করার চেষ্টা চলল। তারপর শেষবারের মত একবার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে যেন বলল, 'যাও, নতুন এসেছ বলে এবারকার মত মাপ করে দিলাম। আবার যদি সামনে পড়ো···হু-হুঁ, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ!'

কিশোরকে ভালমত শাসিয়ে দিয়ে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়ল শুয়োরটা।

কিশোরও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, বাচ্চাগুলোকে মা-হারা করতে হলো না বলে। চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফোঁস করে ছাড়ল। রুমাল দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। পিস্তলটা পকেটে ভরল না আর। এগোতেও সাহস করছে না। ধাড়িটাকে বিশ্বাস নেই। পায়ের শব্দ শুনলে কোনদিক থেকে বেরিয়ে আবার আক্রমণ করে বসে কে জানে। বলা যায় না, পরিবারের কাছে হিরো হওয়ার বাসনায় পুরুষটাও এসে হামলা চালাতে পারে। নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও আছে ওটা। বউ-বাচ্চা ফেলে বেশি দূরে যাওয়ার কথা নয়।

তবে হিরো হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করল না বাবা-শূকর। এই দুপুর রোদের মধ্যে কাদাপানিতে গড়াগড়ি করে দিবানিদ্রা দেয়াটা বরং অনেক আরামের। এল না ওটা। কোন সাড়াশব্দও নেই।

আবার এগোতে লাগল কিশোর। পিস্তলটা হাতেই রাখল। কোনদিক দিয়ে শুয়োরটা বেরোয় কিনা দেখতে দেখতে চলল।

অবশেষে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে একটা পাথুরে অঞ্চলে বেরিয়ে এল সে। চারদিকে শুধু পাথর আর পাথর। সামনে বড় একটা শুকনো ডোবা। পলি পড়ে আছে। পেরোতে গিয়ে বুঝল, যেটাকে লবণ আর কাদার আস্তর মনে করেছিল, সেটা আসলে মাছের কঙ্কাল–ছোট ছোট মাছ মরে কঙ্কালগুলো কয়েক ইঞ্চি পুরু হয়ে জমে গেছে। পায়ের চাপে মড়মড় করে ভাঙতে লাগল। ডোবাটায় পানি ছিল কিছুদিন আগেও, রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, আটকা পড়া মাছগুলো মারা গেছে তখন। তারমানে কোন কারণে বছরের কোন একটা সময়ে পানি বাড়ে সাগরের, মূল ভূমিতে ঢুকে পড়ে বন্যা সৃষ্টি করে তলিয়ে দেয় সবকিছু।

যতটা পথ এসেছে, তার মধ্যে এই অংশটা পেরোনো মোটামুটি সহজ হলো। যে কোন সময় সামনে ল্যাগুনটা চোখে পড়বে আশা করছে। কিন্তু কিছুদূর এগিয়ে একটা উঁচু জায়গা পেরোতেই সামনে আবার দেখা গেল কাঁটাঝোপ। ভাগ্য ভাল, এখানেও শুয়োরের তৈরি করা রাস্তা পেয়ে গেল। পার হয়ে আসতে তেমন কষ্ট হলো না।

উঁচু ঘন ঝোপ পার হয়ে সবে বেরিয়ে এসেছে, সামনে পড়ল একজন মানুষ। শহরের সেই পোশাক নেই লোকটার পরনে, তবু নিগ্রোটাকে চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না ওর।

ফ্রিক সায়ানাইড!

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে-চোখে তাকিয়ে রইল দুজনে। চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে হাসল ফ্রিক। বিষাক্ত হাসি। পকেট থেকে একটা ক্ষুর বের করে ধার করার জন্যে নাপিতের মত হাতের তালুতে ঘষতে ঘষতে,

এগিয়ে আসতে লাগল কিশোরের দিকে।

আট

কিশোর যেদিকে গেছে, তার উল্টোদিকে এগোতে গিয়ে মুসা আর রবিনও প্রায় একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। এদিকটাতেও পাথর, লবণ, কাঁটাঝোপ, খাদ আর টিলাটক্কর। আকাশ থেকে দেখে যে জায়গাকে একেবারেই সমতল মনে হয়েছিল, সেটা যে এতটা প্রতিকূল, ভাবতে পারেনি। চলা হয়ে পড়ল অতিমাত্রায় ধীর। কখনও কখনও যন্ত্রণাদায়ক। তারপর সামনে পড়ল একটা বালির পাহাড়, উপকূলের কিনারে ঝালরের মত, তাতে চড়ে চলাটা কিছুটা সহজ হলো। তারপরেও ভীষণ তপ্ত পা দেবে যাওয়া নরম বালিতে পা ফেলে চলতে বেশ অসুবিধে।

একপাশে খোলা নীল সাগর, খোলা আকাশ। সামনে গরান গাছের জঙ্গলটা কালো, নিরানন্দ। কাছাকাছি এসে গতি কমিয়ে দিল আবার। শত্রুর চোখ এড়ানোর জন্যে সাবধান হতে হলো।

যতটা সম্ভব আড়ালে আড়ালে চলে এসে পৌঁছল বনের কিনারে। বড় বড় গাছের ছায়ায় থামল মিনিটখানেক জিরিয়ে নিতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিশোরের মতই উদ্বিগ্ন হলো রবিন। অনেক সময় লেগে গেছে। মুসাকে জানাল, আসতেই লেগেছে তিন ঘণ্টা। ওমর যে সময় বেঁধে দিয়েছে ওই সময়ের মধ্যে ফিরে যেতে পারবে না। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, কিশোরেরও একই অবস্থা হয়েছে। সময়মত সে-ও ফিরতে পারবে না বিমানে।

আবার রওনা হলো দুজনে। কয়েক পা গিয়েই থমকে দাঁড়াল মুসা। পায়ের কাছে পড়ে গেঁথে গেল একটা খুদে বর্শা। ডার্টগান থেকে ছোঁড়া কাঠির মত দেখতে।

'খাইছে!' লাফ দিয়ে ওর হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। চোখের পলকে সরে গেল একটা গাছের আড়ালে। ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকাতে শুরু করল সে। 'জংলী নাকি! শুনেছি এক সময় এসব দ্বীপে মানুষখেকোদের ছড়াছড়ি ছিল!'

হেসে ফেলল রবিন। আশেপাশে হাত তুলে দেখাল ওরকম অসংখ্য বর্শা মাটিতে পড়ে আছে। 'ওগুলো বর্শা নয়। গাছের বীজ।'

হাঁ হয়ে গেল মুসা।

'গরান গাছ জন্মায়ই পানিতে, বিশেষ করে যেখানে জোয়ার-ভাটা হয়। সাধারণ বীজের মত নিচে পড়লে পানিতে ভেসে যাবে, তাই ফল ফেটে কাঠির মত বীজগুলো তীব্র গতিতে ছুটে আসে। কাদায় গেঁথে যায়। জোয়ারের পানি ভাসিয়ে নিতে পারে না। আস্তে আস্তে শেকড় বেরোয়, মাটি আঁকড়ে ধরে, তখন তো আর নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

গরান বন একটা অতি বাজে জায়গা. কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই

ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে গেল মুসার। আকাশ থেকে দেখে এতটা বড় লাগেনি বনটাকে। থকথকে কাদা। পা ফেললেই দেবে যায়। জোয়ারের পানি আটকে থাকে। হাঁটার সময় হুসুত হুসুত শব্দ তোলে পানি আর কাদা। শেকড়গুলো অক্টোপাসের বাহুর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আঠাল কাদায় ওদের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, অথচ বড় বড় গোলাপী রঙের কাঁকড়া, কয়েক ধরনের গিরগিটি আর জলাভূমির অন্যান্য জীব দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়কর গতিতে পিছলে সরে যাচ্ছে কেউ কেউ।

চোরাকাদার ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে হাঁটার কারণে দিক ঠিক রাখা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। একটু পর পরই কম্পাস দেখতে হচ্ছে। কাদার মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে দুজনেই বিরক্ত হয়ে গেছে, এই সময় শক্ত মাটির নাগাল পাওয়া গেল। মাটি এখানে ভেজা, পিচ্ছিল। তবে কাদার মত পা দেবে যায় না।

হঠাৎ জুতোর ছাপ চোখে পড়ল মুসার।

পায়ে চলা একটা পথের হদিসও বের করা গেল। সেটা ধরে কিছুদূর চলার পর পানি চোখে পড়ল। জঙ্গলের ভেতর থেকে লম্বা একটা উপখালের মত বেরিয়ে এসেছে, তাতে কালো পানি। খালটা ধরে কিছুটা ভেতরে ঢুকে যেতেই খাঁড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। তাতে ভাসতে দেখা গেল একটা ইয়ট। গলুইয়ের কাছে বড় বড় অক্ষরে লেখা: ROGUE

গাছের ডালপালা এমনভাবে জড়াজড়ি করে আছে ওখানে যে, মাথার ওপর চাঁদোয়া তৈরি করে ফেলেছে। প্লেন থেকে দেখা যায়নি সেজন্যেই।

ডেকে বসে সিগারেট টানতে টানতে কথা বলছে তিনজন শ্বেতাঙ্গ। একজন ব্রন ডুগান। অন্য দুজনকে চিনতে পারল না দুই গোয়েন্দা। তবে কিশোরের কাছে চেহারার যা বর্ণনা শুনেছে তাতে অনুমান করতে পারল একজন নকল ডুগান, হোটেলের খাতায় যার নাম লেখা হয়েছিল রৎসি ব্রোমানভ। তৃতীয় লোকটার পরনে নাবিকের পোশাক, মাথায় ক্যাপ। চতুর্থ আরও একজন আছে, নিগ্রো। রেলিঙে হেলান দিয়ে অলস ভঙ্গিতে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ঠিক নিচেই জাহাজের গায়ে গা ঠেকিয়ে একটা নৌকা বাঁধা।

রবিনের বাহুতে হাত রেখে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক জায়গাতেই এসেছি আমরা।'

'দেখা তো হলো। তাড়াতাড়ি চলো এখন, গিয়ে খবরটা জানাই।'

'উঁহু, কাদার কি গন্ধ দেখেছ!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'যাব? কাছে গিয়ে শুনি না ব্যাটারা কি বলে? দু'চারটে কথা শুনলেই বোঝা যাবে ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

'নর্দমার চেয়ে খারাপ গন্ধ। বসে আছে কি করে ওরা!'

'কি বলো? যাব কাছে?'

'যদি দেখে ফেলে?'

'ঝুঁকি তো আছেই। কিন্তু না শুনলে বুঝবও না।'

'চলো।'

হাঁটতে শুরু করল মুসা। সরাসরি যেতে পারলে বড়জোর পঞ্চাশ গজ হতো, কিন্তু তাহলে পানি পেরিয়ে যেতে হয়। সেটা সম্ভব নয়। পানিকে একপাশে রেখে গাছপালার ভেতর দিয়ে কাছে যেতে কমপক্ষে আধমাইল। রাস্তা ভাল হলে ওইটুকু কিছুই না। কিন্তু গরানের জলাভূমির মধ্যে এ এক বিরাট দূরত্ব। চলা ভীষণ ক্লান্তিকর। তবে কিছুদূর এগোনোর পর শক্ত মাটি পাওয়া গেল। পায়ে চলা পথ চলে গেছে ম্যান-অভ-ওঅর বে'র দিকে।

ইয়টের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় গাছের অন্যপাশ থেকে বেরিয়ে একজন মানুষকে ওই রাস্তা ধরে তাড়াহুড়া করে আসতে দেখা গেল। সাবধান না থাকলে ধাক্কাই লেগে যেত লোকটার সঙ্গে। চট করে সরে গেল ওরা গাছের আড়ালে।

লোকটার গায়ের রঙ কালো, তবে নিগ্রো নয়। খোলা গা। নোংরা শার্টটা খুলে বাঁ বাহুতে জড়িয়ে নিয়েছে। তাতে প্রচুর রক্ত লেগে আছে।

সামনে দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল লোকটা। মাটির দিকে নজর রেখে চলতে হচ্ছে। আহত বলে সতর্কতাও কিছুটা কম। কোনদিকে তেমন তাকাচ্ছে না। নইলে দেখে ফেলত ওদের।

'আমার মনে হয় এই লোকটাই ফ্রিক,' মুসার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল রবিন।

পানির কিনারে গিয়ে ডাক দিল ফ্রিক। নড়ে উঠল রেলিঙে হেলান দিয়ে থাকা নিগ্রো লোকটা। বোটে নেমে দাঁড় বেয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আহত ফ্রিককে তুলে নেয়ার জন্যে।

তিন শ্বেতাঙ্গও চেয়ার থেকে উঠে এল। ডেকে উঠতে সাহায্য করল ফ্রিককে।

হাতের কাপড় সরাল ফ্রিক। তীক্ষ্ণ স্বরে বলতে শুরু করল কি করে জখমটা হয়েছে। ইংরেজিতেই বলছে, সুতরাং বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিন আর মুসার। বলল, পাখির কলোনির দিক থেকে আসছিল সে। হঠাৎ সামনে পড়ল তিন গোয়েন্দার এক গোয়েন্দা। কোঁকড়াচুলো ছেলেটা। গুলি করে জখম করেছে ওকে।

'কিশোর!' দম আটকে যাবে যেন মুসার।

'তুমি কি করলে?' ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল শ্বেতাঙ্গ নাবিক।

হাসল ফ্রিক। দাঁত বের করে ভেঙচি কাটল যেন ক্ষুধার্ত হায়েনা। মেরুদণ্ডে শীতল শিহরণ খেলে গেল রবিনের।

'আমাকে গুলি করে, এত্তবড় সাহস!' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ফ্রিক।

ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে এল শ্বেতাঙ্গ নাবিক। জখমটা ধুয়ে বেঁধে দিতে লাগল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বকর বকর করেই চলেছে ফ্রিক। কড়া আঞ্চলিক টান আর অশুদ্ধ উচ্চারণের জন্যে বেশির ভাগই বুঝতে পারছে না রবিন আর মুসা।

ফ্রিকের কাছে দাঁড়িয়ে শুনছে ডুগান। সিগারেট টানছে নীরবে। ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছে। তারপর আচমকা ছুঁড়ে দিল যেন প্রশ্নটা, 'ল্যাগুনটা পেয়েছ?'

'তা তো পেয়েছিই।'

'ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছ?'

'সেজন্যেই তো পাঠানো হয়েছিল আমাকে। নাকি?'

'ছবিগুলো কই?'

পকেট থেকে একটা খাম বের করে দিল ফ্রিক। রবিন বুঝতে পারল, এগুলো হেসের তুলে আনা ছবির প্রিন্ট।

'কোনটা?' আবার জিজ্ঞেস করল ডুগান।

একটা ছবিতে টোকা দিল ফ্রিক, 'এটা।'

আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ডুগান। তারপর ফিরল দুই শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর দিকে। 'ঠিকই আছে। যাবে নাকি?'

'আজ তো আর সময় নেই,' শ্বেতাঙ্গ নাবিক বলল। 'ব্যারোমিটার যে হারে নামছে, আবহাওয়ার অবস্থা খুবই খারাপ। এই অবস্থায় খোলা সাগরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। এখানে থাকলে নিরাপদে থাকব।'

নকল ডুগান, অর্থাৎ ব্রোমারের দিকে ফিরল ডুগান। 'নিচে চলো।'

কম্প্যানিয়ন ওয়ে ধরে এক এক করে নিচে নেমে গেল তিন শ্বেতাঙ্গ।

'এইবার ফেরা উচিত,' রবিন বলল। 'আর কিছু জানার নেই। ফ্রিকের কথাবার্তা আমার ভাল লাগল না। কিশোরকে কি করেছে ও?'

গাল চুলকাল মুসা, 'বুঝতে পারছি না! নিশ্চয় কিছু করেছে। নইলে গুলি করত না কিশোর।'

'ওমর ভাইকে জানানো দরকার। চলো। গিয়ে যদি দেখি কিশোর ফেরেনি, খুঁজতে বেরোতে হবে ওকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওপর দিকে তাকাল মুসা। গাছের মাথার জন্যে ভালমত চোখে পড়ল না আকাশটা। তবে কালো মেঘ যে ছড়িয়ে পড়ছে, বোঝা যায়। 'গরম কি দেখেছ! বাপরে! তারমানে সত্যি খুব খারাপ অবস্থা। ঝড় আসবে। চলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না। ওমরভাই খুব চিন্তায় পড়ে যাবে।'

ফিরে চলল ওরা।

রাস্তায় উঠে আবার আকাশের দিকে তাকাল দুজনে। অনেক নিচে যেন ঝুলে রয়েছে কালো মেঘ।

ফ্রিক যে পথে এসেছিল, জঙ্গল থেকে বেরোল ওরা ওই পথ দিয়ে। কাদাপানি মাড়ানোর কষ্ট করল না অহেতুক। বনের বাইরে ঝোপঝাড় আর অন্যান্য বাধা তো রয়েছেই।

দিগন্তের কাছে নেমে গেছে সূর্য। গোল লাল একটা বল যেন। চারপাশে কালো মেঘ। বিচিত্র দৃশ্য।

নয়

সৈকতে অস্থির হয়ে পায়চারি করছিল ওমর। ওদের দেখেই ছুটে এল। 'এত

সময় লাগালে?'

মুসা জানতে চাইল, 'কিশোর ফিরেছে?'

'না।'

'আল্লাই জানে কি হলো!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'ফ্রিক সায়ানাইডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে ওর।'

চমকে উঠল ওমর। 'তুমি জানলে কি করে?'

'ফ্রিক বলেছে ডুগানকে। আমাদের দেখেনি। হাতে একটা জখম। কিশোর নাকি গুলি করেছে।'

'সর্বনাশ! সহজে তো গুলি করার কথা নয় কিশোরের! আর কি বলল?'

যা যা শুনেছে, ওমরকে জানাল দুজনে।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল ওমর। 'তোমরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে, ভুল করে ফেলেছি। এভাবে আলাদা হওয়াটা মোটেও উচিত হয়নি আমাদের।'

'কিশোরকে নিশ্চয় কিছু করেছে ও,' মুসা বলল। 'খুঁজতে যাওয়া দরকার।'

'কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না। সাগরের যা অবস্থা, ঝড় উঠলে পানি ফুলে উঠে খাঁড়িতেও ঢুকে পড়বে ঢেউ। প্লেনটাকে বাঁচানো যাবে না। ওটা নষ্ট হয়ে গিয়ে এখানে আটকা পড়লে সাংঘাতিক বিপদ হবে। আর কিশোর যদি জখম হয়ে থাকে, তাহলে তো পড়ব আরও বিপদে। কতটা জখম হয়েছে ও, জানি না। বেশি হলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। প্লেন ছাড়া সেটা সম্ভব না।'

চুপ করে রইল মুসা আর রবিন।

পায়চারি শুরু করল ওমর। মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছে এগোতে থাকা জোয়ারের পানির দিকে। খাঁড়িতে পৌঁছতে সময় লাগবে না।

'কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে ওর,' মুসা বলল। 'নইলে এতক্ষণে চলে আসত।'

'তা ঠিক,' দাঁড়িয়ে গেল ওমর, 'শুধু জখম করেছে? মেরে ফেলার কথা কিছু বলেনি তো?'

'বকর বকর করে কি যে বলল, কিছু বুঝলাম কিছু বুঝলাম না। তবে নিজে গুলি খেয়েও কিছুই না করে ছেড়ে দিয়ে আসার বান্দা তো ওকে মনে হলো না।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'দেখি আরও দশটা মিনিট।'

দশ···পনেরো···বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। এল না কিশোর। বাতাসের বেগ দেখতে দেখতে অনেক বেড়ে গেল। কালো হয়ে গেছে আকাশ। আলোও কমতে শুরু করেছে। সাদা ফেনার মালাকে ঠেলে নিয়ে খাঁড়িতে ঢুকতে আরম্ভ করেছে ঢেউ। নোঙরে টান লেগে অস্থিরভাবে ঝাঁকি খাচ্ছে বিমানটা।

'নাহ্, আর অপেক্ষা করা যায় না।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ওমর, 'যত যাই ঘটুক, প্লেনটাকে নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে পারব না। আমি থাকি। রবিনও থাক আমার সঙ্গে।' মুসার দিকে তাকাল, 'তুমি প্লেন নিয়ে জ্যামাইকায় চলে যাও। আবহাওয়া ভাল হলে ফিরে এসো–সেটা কাল, পরশু, যখনই হোক। এসে যদি দেখো, নামতে গেলে প্লেনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, নামবে না। ফিরে যাবে। পরে আবার আসবে। মোট কথা, কোনমতেই প্লেনটা নষ্ট করে এখানে আটকা পড়া চলবে না আমাদের।'

তর্ক করল না মুসা। বুঝতে পারছে, আর কিছু করার নেই। ইচ্ছে থাকলেও কিশোরকে খুঁজতে যাওয়ার জন্যে এখানে থাকতে পারবে না সে। রবিনও প্লেন চালাতে পারে, তবে তার মত অতটা ভাল পারে না। এই খারাপ আবহাওয়ায় প্লেনটা বাঁচানোর দায়িত্ব এখন তাকেই নিতে হবে।

মাংসের টিন, বিস্কুট আর জ্যামের বয়ামগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে নেয়া হলো। ককপিটে উঠে বসল মুসা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল।

ওমর আর রবিন দেখল, ট্যাক্সিইং করে খোলা সাগরের দিকে ছুটে যাচ্ছে বিমানটা। পাহাড়ের মত এক ঢেউ ছুটে আসছে ওটার দিকে। ওটা এসে আঘাত হানার আগেই যদি উড়াল দিতে পারে মুসা, ভাল, নইলে আর পারবে না। বাদামের খোসার মত বিমানটাকে উল্টে দেবে ওই পানির পাহাড়।

শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে দুজনে।

এসে পড়ল ঢেউ। ঠেলা মারল বিমানের নিচে। এক ঠেলাতেই কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল বিমানটা। আর নামল না। কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত এক জায়গায় ঝুলে রইল যেন। তারপর দ্রুত উঠতে শুরু করল ওপরে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ওমর। 'ওফ্, বাঁচা গেল! আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম, গেল বুঝি প্লেনটা।'

বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আচমকা বেড়ে গেল বেগ। মুহূর্তে পানির ফোঁটার একটা চাদরে পরিণত হলো যেন। বাতাসের ঝাপটায় ফোয়ারার মত ছিটকে এসে পড়তে লাগল ওদের চোখেমুখে।

টিনগুলো নিয়ে দৌড় দিল দুজনে। কতগুলো প্রবালের চাঙড়ের আড়ালে ছোট একটা ফোকরমত হয়ে আছে। আশ্রয় নেয়ার মত আর কোন জায়গা না দেখে ওটার দিকেই ছুটল ওরা।

'যা অবস্থা,' ভেতরে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল ওমর, 'খুঁজতে যেতেও পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

'যাওয়াটা ঠিকও হবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন। 'জায়গার যা অবস্থা দেখে এসেছি! কাঁটাঝোপ, কাদা, পাথর··· অন্ধকারে কোনমতেই পেরোতে পারব না। সকালের জন্যে বসে থাকতে হবে আমাদের। তা ছাড়া এখন গেলে আরও একটা সমস্যা আছে। কিশোর যদি রওনা হয়েই থাকে, এখানে এসে আমাদের না পেলে চিন্তায় পড়ে যাবে। প্লেনটাও দেখবে না। কি করেছি, কোথায় গেছি বুঝতে পারবে না। আহত হয়ে থাকলে খুব মুষড়ে পড়বে।'

'তাই বলে চপচাপ বসে থাকতে পারব না। দরকার হলে তোমাকে

এখানে রেখে আমি একাই খুঁজতে বেরোব। আর কয়েক মিনিট দেখি।'

কিন্তু কয়েক মিনিটে ভয়াবহ রকম বেড়ে গেল বৃষ্টি আর বাতাসের বেগ। হাজার হাজার সাইরেনের শব্দ তুলে বইছে বাতাস। যেন কোন দানবের ক্রুদ্ধ, তীক্ষ্ণ চিৎকার। বৃষ্টি এত ঘন, কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না।

'নাহ্, বেরোতে আর পারলাম না!' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ওমর, 'বেরিয়ে কোন লাভও নেই এই অবস্থায়। দশ হাত দূর দিয়ে পার হয়ে গেলেও দেখতে পাব না ওকে। তোমার কথাই ঠিক। ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করতেই হবে আমাদের।'

দশ

অতি জঘন্য একটা রাত কাটল ওমর আর রবিনের। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। ঝড়ের ভয়ঙ্করত্ব তো আছেই, সেই সঙ্গে কিশোরের দুশ্চিন্তা।

ভোরের দিকে ঝড় থামল। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। আলো ফোটার দেরি আছে। সাগর এখনও উত্তাল, তবে খাঁড়ির মধ্যে ঢেউ অনেক কমে গেছে।

সারারাত খাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে বেরিয়ে এল দুজনে। আকাশে এখনও তারা থাকলেও উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে গেছে ওদের শরীর। প্রবালের চাঙড় পুরোপুরি পানি ঠেকাতে পারেনি। কাপড়ও ভেজা। নিঙড়ে নিল। সূর্য এখন অতি প্রত্যাশিত।

ল্যাগুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল ওরা। পরিত্যক্ত সেই গ্রামটাতে পৌঁছল। ঝড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোন ঘরে রাত কাটিয়ে থাকতে পারে কিশোর। চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাক দিল কয়েকবার ওমর। সাড়া পেল না।

'জবাব দেয়ার সাধ্যই হয়তো নেই,' রবিন বলল। 'ফ্রিক ওকে জখম করে রেখে গেছে। বেহুঁশও হয়ে আছে।'

তারমানে ঘরগুলো খুঁজে দেখা দরকার।

খুঁজতে খুঁজতে এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করল ওরা, যেটা আগের দিন কিশোরের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। একটা কুঁড়েকে মেরামত করে নেয়া হয়েছে, অন্যগুলোর মত বিধ্বস্ত নয়। এর একটাই মানে, লোক বাস করে এটাতে। দরজার বাইরে কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়ছে এক প্রৌঢ়া নিগ্রো মহিলা। বিশালদেহী, অ্যাথলেটদের মত স্বাস্থ্য। কাছেই একটা গাধা বেঁধে রেখেছে।

অবাক হলো ওমর। সারা গাঁয়ে মাত্র একজন মানুষ। তাও মহিলা।

দেখে খুশিই হলো। কিশোরকে দেখেছে কিনা, জিজ্ঞেস করার জন্যে এগোতে গেল। কিন্তু কড়াল ফেলে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গেল মহিলা। দড়াম

করে দরজা লাগিয়ে দিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল ওমর। জবাব দিল না মহিলা। তবে বোঝা গেল, লুকিয়ে ওদের দেখছে।

রবিনের দিকে তাকাল ওমর। 'এমন করল কেন?'

'ভঙ্গি দেখে তো মনে হলো চুরি করে ধরা পড়েছে। এই বিজন এলাকায় কোন্ অপরাধ করল সে?'

আরও কয়েকবার দরজা খোলার জন্যে অনুরোধ করে শেষে হাল ছেড়ে দিল ওমর। নাহ্, মহিলার কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। আবার রওনা হলো, যেদিকে যাচ্ছিল।

কাঁটাঝোপগুলো সামনে পড়তে ওমর বলল, 'সাংঘাতিক জায়গা। অন্ধকারে কোনমতেই এর ভেতর দিয়ে চলা যাবে না।'

দুজনের একজনও ভোলেনি, কিশোরের না ফেরার ভিন্ন কারণও থাকতে পারে। ফ্রিক ওকে খুনই করে ফেলেছে হয়তো। তবে এই কুভাবনাটা মনে আনতে চাইল না কোনমতে। ধরেই নিল ঝড়ের জন্যে, কিংবা বড়জোর জখমের কারণে আটকা পড়েছে কিশোর।

কিছুদূর এগিয়েই মুখের কাছে হাত জড় করে চিৎকরে করে ওর নাম ধরে ডাকতে লাগল ওমর। জবাব এল না। ছড়ানো, খোলা সমভূমিতে শব্দের কোন প্রতিধ্বনিও হলো না।

ঝোপ-জঙ্গলের অন্যপাশে এসে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল দুজনের। উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসতে দেখা গেল কিশোরকে।

ওদের দেখে হাত নাড়ল কিশোর। প্রায় ছুটে আসতে শুরু করল। সামান্যতম জখমও হয়েছে বলে মনে হলো না।

'এখানে পাঠিয়েই ভুলটা করেছি আমি,' কাছাকাছি হতেই ওমর বলল। 'ওফ্, জায়গা নাকি এটা! তুমি জখমও হওনি?'

'কেন, হওয়ার কথা নাকি?'

'ফ্রিকের সঙ্গে মোলাকাত হয়েছিল তোমার?' জানার জন্যে তর সইছে না আর রবিনের।

'হয়েছিল। একটা ক্ষুর বের করে গলা কাটতে এসেছিল আমার। দিলাম গুলি মেরে। হাতে লাগল। পিস্তলের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়েছি। আপাতত গেলেও আবার আসবে, জানা কথা। ঝড় না হলে এতক্ষণে কখন দলবল নিয়ে চলে আসত।'

'বাঁচালে, ভাই। সারাটা রাত যে কি দুশ্চিন্তায় কেটেছে!' ফ্রিকের ফেরা নিয়ে মাথাই ঘামাল না রবিন। 'তোমার কিছু করতে পারেনি তো?'

'না। একটা আঁচড়ও না। ফ্রিকের কথা তোমরা জানলে কি করে?'

'গরান গাছের জঙ্গলের মধ্যেই ইয়ট নিয়ে ঢুকে বসে আছে ডুগান।' সে আর মুসা গিয়ে কি কি দেখে এসেছে, জানাল রবিন।

মুসা কোথায় জানতে চাইল কিশোর। বিমান নিয়ে চলে গেছে শুনে ওমরকে বলল, 'পাঠিয়ে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। প্লেনটা নষ্ট হলে

মহাবিপদে পড়তাম। রাত কাটালেন কোথায়?'

কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল জানিয়ে ওমর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় কাটিয়েছ?'

মুচকি হাসল কিশোর, 'আপনাদের চেয়ে ভাল জায়গায়ই উঠেছিলাম আমি। ল্যাগুনের পাশে যে উঁচু জায়গাটাকে ঢিবি মনে করেছিলাম আমরা, ওটা আসলে একটা কুঁড়ে। ফিরে যেতে রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো, এগোতে আর পারলাম না। বাধ্য হয়ে ঢুকে পড়লাম ওটাতে।'

'কুঁড়ে, না?' খসখসে গালে হাত বোলাল ওমর। খোঁচা খোঁচা হয়ে গেছে দাড়ি। 'কিছু আছে নাকি ভেতরে?'

'তেমন কিছু না। ঘরের মেঝেতে এক জায়গায় মাটি কিছুটা অন্য রকম মনে হলো। খোঁড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু খালি হাতে পারলাম না। পকেট নাইফটাও অতিরিক্ত ছোট। শাবল-টাবল বা অন্য কিছু দরকার। আমার ধারণা, এখানে এলে ওই কুঁড়েটাতেই থাকত হেস।' তার কথার সপক্ষে পকেট থেকে একটা ক্যামেরার ফিল্মের বাক্স বের করে দেখাল কিশোর। ফিল্মটা খুলে নিয়ে বাক্সটা ফেলে দিয়েছিল হেস। প্রায় নতুন। ঘরের মধ্যে থাকাতে নষ্ট হয়নি।

বাক্সটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে ওমর বলল, 'অন্য কেউও এসে থাকতে পারে, পাখির ছবি তোলার জন্যে। তবে মনে হচ্ছে তোমার ধারণাই ঠিক। হেসই এসেছিল। চলো তো দেখি, মাটির নিচে কি লুকিয়ে রেখেছে?'

'খুঁড়বেন কি দিয়ে?'

'ডালের মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে।'

কিন্তু ডাল বলতে কাঁটাঝোপের কাণ্ড। এই জিনিস দিয়ে কতখানি খোঁড়া যাবে সন্দেহ আছে। তার ওপর রয়েছে গা ভর্তি কাঁটা। কিশোরের ছোট ছুরি দিয়ে কাণ্ড কেটে, কাঁটা ছাড়িয়ে, মাথা চোখা করে নিতে লেগে গেল প্রায় এক ঘণ্টা। তারপর সেই বিচিত্র মাটি খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে 'বীরদর্পে' রওনা হলো ওরা গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে।

কুঁড়ের কাছে নিরাপদেই পৌঁছল তিনজনে। কোন অঘটন ঘটল না।

কিশোরকে দরজায় পাহারা রেখে অন্য দুজন মাটি খুঁড়তে শুরু করল। কাজটা মোটেও সহজ নয়। তবে খুব ধীরে হলেও গর্তটা বড় হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ওমরের অস্ফুট চিৎকার শুনে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। একটা বোতাম পেয়েছে ওমর। জ্যাকেটের হাতার বোতাম।

গর্তটাকে আরও গভীর করতে লাগল ওরা। পরিশ্রমে ঘাম জমেছে কপালে। হাল ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছে রবিন, এই সময় একটা কঠিন জিনিসে খোঁচা লাগল ওমরের ডাল। নতুন উদ্যমে আবার খুঁড়তে লাগল দুজনে।

কিশোর বলল রবিনকে, 'তুমি এসে পাহারা দাও। জিরিয়ে নিতে পারবে। ততক্ষণ আমি খুঁড়ি।'

'লাগবে না,' গুপ্তধন প্রথম পাওয়ার উত্তেজনাটা যেন হারাতে চাইল না

কাঠের একটা অংশ দেখা গেল। পুরোটা বের করতে হলে আরও খোঁড়া দরকার।

'বাক্স নাকি!' চিৎকার করে উঠল উত্তেজিত রবিন।

'খুঁড়তে থাকো,' ওমর বলল।

বাক্সের ডালার মত চারকোনা তক্তাটা উন্মুক্ত হলো অবশেষে। একধারে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টানতে শুরু করল ওমর। উঠে এল ওটা। নিচে একটা গর্ত। শূন্য।

পাহারা ভুলে গিয়ে কিশোরও এসে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে গর্তের কাছে।

কয়েকটা সেকেন্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর গর্তটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভোঁতাস্বরে বিড়বিড় করল ওমর, 'নিয়ে গেছে!'

'এত কষ্ট খামোকাই করলাম!' নিরাশ হয়ে গর্তের কিনারে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল রবিন।

'ছিল এখানে কোন সন্দেহ নেই,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল ওমর। 'সব মিলে যাচ্ছে—ল্যাণ্ডন, চিহ্ন, পাখি, সব। এখানেই রেখেছিল হেস।'

'ডুগান নিয়ে গেছে?' রবিনের প্রশ্ন।

একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে ভাবল ওমর। তারপর বলল, 'মনে হয় ফ্রিকের কাজ। ডুগান ওকে পাঠিয়েছিল তুলে নিয়ে যেতে। তুলে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছে সে। যাতে আমাদের হাতে না পড়ে। লুকিয়ে রেখে ওর তরফ থেকে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। নইলে তুমি কেড়ে নিতে,' কিশোরের দিকে তাকাল সে।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'কোথাও একটা গণ্ডগোল আছে। ফ্রিক ওটা পেয়ে গিয়ে থাকলে এতক্ষণে নেয়ার জন্যে কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দিত ডুগান। তা ছাড়া ফ্রিকের সঙ্গে যা কথা হয়েছে ওদের, রবিনের কাছে শুনলাম, ফ্রিক ওকে একবারও বলেনি, জিনিসটা সে পেয়েছে।'

'মিথ্যে কথা বলতে পারে,' রবিন যুক্তি দেখাল। 'জিনিসটা যে দামী, একথা ফ্রিকও বুঝে গেছে। লুকিয়ে রেখে গেছে। পরে অন্য কারও কাছে বেশি দামে বিক্রির আশায়।'

'সেটা অসম্ভব নয়। কিন্তু মাটির অবস্থা দেখো,' গর্তের দিকে আঙুল তুলল কিশোর, 'গতকাল খোঁড়া হয়েছে বলে মনে হয় না। তাহলে আরও বেশি আলগা থাকত। খোঁড়া হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। তা ছাড়া ও খুঁড়ে থাকলে মাটি ভরাট করার দরকার মনে করত না আর। এমনিই ফেলে রেখে গিয়ে ডুগানকে বলত—খুঁড়েছি, পাইনি।'

'তা ঠিক,' হাত ওল্টাল রবিন। 'যুক্তিতে তো কোনদিনই তোমার সঙ্গে পারিনি। আজ কি আর পারব। কিন্তু ফ্রিক যদি না পেয়ে থাকে, কেউ তো একজন পেয়েছে। সে কে?'

দরজার বাইরে চোখ পড়তে বলে উঠল কিশোর, 'ওই যে, আসছে।

জিজ্ঞেস করা যাবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ওমর, 'কে?'

'ফ্রিক আর ডুগানের দোসর।'

ওমর আর রবিনও দেখতে পেল। সাগরের দিক দিয়ে সৈকত ধরে আসছে ওরা।

'তারমানে সত্যি পায়নি ডুগান,' এতক্ষণে নিশ্চিত হলো ওমর।

'কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিছুই না।'

'কিছুই না!'

'না। কি করব? জিনিসটা পাইনি আমরা। আসুক ওরা। দেখুক, পাইনি যে।'

এগিয়ে এসেছে ব্রোমানভ আর ফ্রিক। পেছনে ডুগানকেও দেখা যাচ্ছে এখন।

দরজার কাছ থেকে সরে রইল দুই গোয়েন্দা আর ওমর। বাইরে থেকে ওদের দেখতে পেলে সাবধান হয়ে যাবে ডুগানরা। হামলা করে বসতে পারে।

কুঁড়ের কাছে চলে এল ওরা। ডুগানের কথা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, এটাই হবে। কুঁড়ের কথা বলেছিল আমাকে হেস। ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। পাখির ল্যাণ্ডনের ধার ঘেঁষেই রয়েছে কুঁড়েটা। আশেপাশে আর কোন কুঁড়েও নেই। সুতরাং...'

'আপনার কথা ঠিক হলেই ভাল,' নিঃসন্দেহে ব্রোমারের কণ্ঠ। খসখসে। কথায় ইয়োরোপিয়ান টান। 'এই ফ্রিক, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঢোকো।'

পায়ের শব্দ এগিয়ে এল।

দরজার কাছে চলে গেল ওমর। ডুগানের দিকে তাকিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে হেসে স্বাগত জানাল, 'গুড মর্নিং।'

পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল ডুগান। পেছনে ফ্রিক আর ব্রোমানভ। স্তব্ধ নীরবতা।

ওমরই কথা বলল আবার, 'এতটা পথ কষ্ট করে খামোকা এলেন, জেনারেল। কিছুই পাবেন না।'

সামলে নিল ডুগান। চোখের পাতা সরু করে ওমরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিছুই পাব না মানে?'

হাসিমুখে জবাব দিল ওমর, 'জিনিসটা নেই এখানে।'

'কোন জিনিস?'

'ভণিতা করে লাভ নেই। কোন্ জিনিসের জন্যে এসেছেন আপনারা, আমরা জানি। হেসের চুরি করে আনা গোপন ফর্মূলা।'

'ও মিথ্যে কথা বলছে!' চিৎকার করে উঠল ব্রোমানভ। 'ঠিকই পেয়ে গেছে, আমাদের বলছে না!'

'মিথ্যুকরা সব সময় অন্যদেরও মিথ্যুক ভাবে,' মসৃণ কণ্ঠে জবাব দিল ওমর।

ফ্রিকের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল ব্রোমানভ, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন হাবার মত! কিছু একটা করো!'

পা বাড়াতে গেল ফ্রিক। দ্বিধা করছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল ওমর। হাতে বেরিয়ে এল পিস্তল। 'কাল খেয়েছিলে হাতে, আজ খাবে পেটে। এক ইঞ্চি এগোবে না আর।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ডুগান। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখল গর্তটা। ওমরের দিকে তাকাল, 'সত্যি কিছু পাওয়া যায়নি?'

'পেয়েছি। একটা সাধারণ বোতাম আর একটা পুরানো তক্তা। নিতে চাইলে নিতে পারেন।'

ওমরের কথা বিশ্বাস করল ডুগান। মাথা ঝাঁকিয়ে পিছিয়ে গেল।

রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্রোমারের মুখ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে। ধমকে উঠল ওমরের দিকে তাকিয়ে, 'কোথায় সরিয়েছ, জলদি বলো!'

ডুগানের দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে ওমর বলল, 'একটা কথা প্রায়ই ভাবি আমি, জেনারেল। আমার মাথায় ঢোকে না, সেনাবাহিনীর এতবড় পদে চাকরি করে, একজন ভদ্রলোক হয়ে চোর-ছ্যাঁচড় আর এসব ছুঁচোদের সঙ্গে আপনার খাতির হয় কি করে?'

পলকের জন্যে জেনারেলের মুখে লজ্জার ছায়া দেখতে পেল বলে মনে হলো কিশোরের। ভালমত দেখা হলো না, তার আগেই ব্রোমারের গর্জনে তার দিকে নজর ফেরাতে হলো।

ক্ষিপ্ত হয়ে মুঠো পাকিয়ে চিৎকার করছে ব্রোমানভ, 'অনেক সহ্য করেছি, আর না! ভাল চাও তো জিনিসটা দাও, নইলে···'

'নইলে কি করবেন?' হাসি হাসি ভঙ্গিটা উধাও হয়ে গেছে ওমরের মুখ থেকে। 'ভদ্রতা অনেক করেছি। ভাল চান তো বিদেয় হন এখান থেকে।' ভয়ানক ভঙ্গিতে পিস্তল নাচাল।

কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না যেন ব্রোমানভ। ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। টাকা খেয়েও ওর কাজ করছে না বলে ধমকাতে লাগল ফ্রিককে। ভীতু, কাপুরুষ বলে গাল দিল। কোন কিছুতেই কাজ হলো না দেখে ওমরের দিকে তাকাল আবার, 'তোমাকে···তোমাকে আমি দেখে নেব! আবার দেখা হবে আমাদের!'

'হ্যাঁ, হলেই ভাল। এখনকার অসমাপ্ত কাজটা আমি শেষ করব তখন। আপনার ওই কুৎসিত চেহারাটা বদলে দেয়ার ব্যবস্থা করব, যাতে অতি কাছের লোকেরও চিনতে না পারে,' পিস্তল তুলে ব্রোমানভের দিকে লক্ষ্যস্থির করল ওমর। 'যান এখন। আপনার উপস্থিতিটাও বিরক্তিকর লাগছে।'

ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্রোমানভ। গটমট করে হাঁটতে শুরু করল। পেছন পেছন চলল তার দুই সঙ্গী। শ'খানেক গজ গিয়ে ঘুরল সে। হাত নেড়ে, মুখভঙ্গি করে কি যেন বলতে লাগল। বোধহয় ঝগড়া শুরু করছে ডুগানের সঙ্গে।

'ব্রোমানভ সহজে ছাড়বে না আমাদের,' ওমর বলল। 'এই অভিযানের

খরচ নিশ্চয় সে-ই দিচ্ছে। ফর্মূলাটা কিনতে চেয়েছে। সেজন্যেই অত রাগ।'

'তাই হবে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'কিন্তু আমি ভাবছি, দলিলটা কে নিয়ে গেল?'

'তাকেই এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।'

'কে নিয়েছে অনুমান করতে পারছি,' কারও দিকে না তাকিয়ে বলল কিশোর।

'কে!' একসঙ্গে ওর দিকে গলা বাড়িয়ে দিল ওমর আর রবিন।

'এক নিগ্রো মহিলা। কাল দেখেছি। ডিম চুরি করতে এসেছিল।'

'সঙ্গে একটা গাধা ছিল?' উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না রবিন।

ওর দিকে ঘুরল কিশোর, 'তুমি জানলে কি করে?'

'আসার সময় দেখে এসেছি।'

'জলদি চলো! ডুগানরা কোনভাবে আঁচ করে ফেলে কেড়ে নেয়ার আগেই ওটা আদায় করতে হবে আমাদের।' প্রায় লাফ দিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল ওমর।

এগারো

মহিলার বাড়ি পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল ওদের। উপকূলের ঘুরপথ কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে শর্টকাটে যাওয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

আঙিনাতেই আছে মহিলা। কুড়ালটা দিয়ে কিসে যেন কোপ মারছে। তবে লাকড়ি নয়। ধাতব শব্দ হলো। বিড়বিড় করে গাল দিচ্ছে, 'শয়তান বাক্স। তোর একদিন কি আমার একদিন। ভেঙেই ছাড়ব আজ।'

এবারও ওদের দেখামাত্র ঘরে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু দৌড়ে গিয়ে পথ আটকাল ওমর, 'প্লীজ, যাবেন না। আমরা আপনার শত্রু নই।'

শত্রু যে নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যে পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স বের করে বাড়িয়ে ধরল ওমর।

মুহূর্তে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব চলে গেল মহিলার। হাসিমুখে হাত বাড়াল। একটু দূরে নির্বিকার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে গাধাটা।

কিশোর গিয়ে নিচু হয়ে ধাতব বাক্সটা তুলে নিল। ওটাকেই কোপাচ্ছিল মহিলা। তেড়াবেঁকা বানিয়ে ফেলেছে। ডালার ওপর বেশ কয়েকটা কাটা। একটা কাটা বেশ বড়।

'কি করছিলেন?' জিজ্ঞেস করল ওমর।

'খোলার চেষ্টা করছিলাম,' আয়েশ করে সিগারেটে টান দিল মহিলা।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাক্সটা দেখতে লাগল কিশোর। তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রবিন। স্টেনলেস স্টীলের বেশ ভারী বাক্স। বড় বড় দুটো তালা লাগানো।

মহিলাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'চাবি নেই?'

'হারিয়ে ফেলেছি।'

'চাবি পানইনি, তাই না?'

চুপ করে রইল মহিলা।

'বাক্সটা কোথায় পেলেন?'

'সৈকতে। ঢেউয়ে ভেসে এসেছিল।'

'নাম কি আপনার?' জানতে চাইল ওমর।

'প্যাটি মেহার।'

'মিথ্যে বলে লাভ নেই, প্যাটি, সব জানি আমরা। সত্যি করে বলুন এখন, কোথায় পেয়েছেন বাক্সটা?'

প্যাটির মাথাটা ঝুলে পড়ল। খুব সাদাসিধা মহিলা। মায়াই লাগল ওমরের। কণ্ঠস্বর নরম করে বলল, 'বলুন?'

'পেয়েছি।'

'পেয়েছেন, সে তো জানিই। কোথায় পেয়েছেন? আপনি কি চান, আমি গিয়ে আপনার ডিম চুরির কথা রিপোর্ট করি?'

'না না!' আঁতকে উঠল মহিলা।

'বললে আপনার কি অবস্থা হবে জানেন?'

'জানি!'

'আমি বলি, কোথায় পেয়েছেন, ফ্ল্যামিঙ্গো ল্যাগুনের পাশের কুঁড়েতে। মাটি খুঁড়ে বের করেছেন।'

এত আস্তে বলল প্যাটি, প্রায় শোনাই যায় না, 'হ্যাঁ, স্যার!'

'ঠিক আছে, প্যাটি, রিপোর্ট করব না। তবে এই বাক্সটা আপনি পাবেন না। এটা সরকারি জিনিস। খুঁজে বের করে আনার জন্যে পুরস্কার যাতে পান, সেই ব্যবস্থা করতে পারি।'

মাথাটা সোজা হলো আবার। উজ্জ্বল হলো প্যাটির মুখ।

'কদ্দিন আগে পেয়েছেন?' জানতে চাইল ওমর।

'সাত দিন।'

'এতদিন খোলার চেষ্টা করেননি?'

'না, স্যার।'

'তাহলে আজকেই কেন?'

সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল প্যাটি, 'এত লোকজন দেখে···ভাবলাম···'

হাসল ওমর, 'কেড়ে নিয়ে যাবে? কি আছে এর মধ্যে?'

'গুপ্তধন, স্যার। এখানকার অনেক দ্বীপেই গুপ্তধন পাওয়ার কথা শোনা যায়। জলদস্যুরা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।'

বাক্সটা ঝাঁকি দিল কিশোর। শব্দ শুনে ভেতরে কাগজ ছাড়া আর কিছু আছে বলে মনে হলো না। কাটা জায়গাটা দিয়ে দেখেও কাগজই আছে মনে হলো। ভারী বলে হাতে রাখতে অসুবিধে হচ্ছে। মাটিতে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কুঁড়েতে ছিল এটা, জানলেন কি করে? সত্যি কথা বলুন। কোন ভয় নেই আপনার।'

ভয় আর দ্বিধা মিশ্রিত, কখনও বা কান্নাজড়ানো স্বরে প্যাটি শোনাল তার দুঃখের কাহিনী। অতি সামান্য বেতনে ফ্ল্যামিঙ্গো পাহারা দেয়ার চাকরিটা তার স্বামীকে দিয়েছিল সরকার। চাকরি পেয়ে ল্যাগুনের ধারেও একটা কুঁড়ে বানিয়েছিল সে। সেটা বহুকাল আগের কথা। কত বছর, সঠিক বলতে পারবে না সে। গাঁয়ের আর সব মানুষের মত মহামারীতে তার স্বামীও মারা গেল। বেঁচে রইল একমাত্র প্যাটি। বেতন পাঠানো বন্ধ করে দিল সরকার। বিধবা হয়ে না খেয়ে মরার দশা হলো প্যাটির। আর কোন উপায় না দেখে ডিম চুরি শুরু করল সে। নিজেও খায়। খেতে ভাল। কিছু কিছু ম্যাথু টাউনেও নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে অন্যান্য জিনিসপত্র কিনে আনে। কোনমতে অতি কষ্টে সংসার চালায়। শুরুতে ভয় ভয় লাগলেও ডিম বিক্রিটাকে এখন আর অপরাধ মনে করে না সে। বরং ভাবে, পাখিগুলোকে সাহায্য করছে। ম্যাথু টাউনে ডিম নিয়ে না গেলে ওখানকার বাসিন্দারা এসে কবে ডিম খেয়ে, পাখিগুলোকে মেরেধরে কলোনিটাই সাফ করে দিয়ে যেত। সে ওদের মিথ্যে কথা বলেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর চাকরিটা ওকেই দিয়েছে সরকার।

মহিলার যুক্তিটা খণ্ডন করতে পারল না ওমর। ঠিকই বলেছে। প্যাটি না থাকলে কে দেখে রাখত পাখিগুলোকে? ওগুলোকে পাহারা দেয়ার বিনিময়ে কয়েকটা ডিম যদি সে নিয়েই থাকে, দোষটা কোথায়? অন্যায়টা বরং সরকার করেছে, হঠাৎ করে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়ে। ওদের কর্মচারী মরে যাওয়ার পর তার বিধবা স্ত্রীকে পেনশন দেয়া অন্তত উচিত ছিল।

যাই হোক, তার কাহিনী বলে গেল প্যাটি। কিছুদিন আগে, একজন অপরিচিত লোককে দেখল সাগরের দিক থেকে আসছে। হাতে একটা বাক্স। প্যাটি ভাবল, ইনস্পেক্টর। কিন্তু লোকটার হাবভাবে সন্দেহ হলো তার। পাখি মারতে আসেনি তো? লুকিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিল লোকটা কি করে। কুঁড়েতে ঢুকল লোকটা। খানিক পর বেরিয়ে চলে গেল। হাতে বাক্সটা নেই। লোকটা চলে যাওয়ার পরও কুঁড়েতে ঢুকল না প্যাটি। সে চোর নয়। কেউ যদি কোন কারণে একটা জিনিস ঘরে লুকিয়ে রেখেই যায়, সেটাতে কি আছে চুরি করে দেখতে যাওয়াও ঠিক নয়।

সময় যেতে লাগল। একদিনের জন্যেও আর এল না লোকটা। কৌতূহল দমন করতে না পেরে গত সপ্তাহে বাক্সটা তুলে নিয়ে আসে প্যাটি। চাবি পায়নি। তালাও খুলতে পারেনি। শেষে কুড়াল দিয়ে কেটে খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ধারণা, অন্য কোনখান থেকে ওই লোকটা গুপ্তধন উদ্ধার করে এখানে এনে লুকিয়ে গেছে। কয়েকজনে মিলে উদ্ধার করার পর একে অন্যকে ঠকানোর জন্যে পাগল হয়ে ওঠে লোকে। বহুকাল থেকেই চলে আসছে এরকম। তাতে অবাক হয়নি প্যাটি।

'এখন জানল, বাক্সটা সরকারের। চুরি করে অন্যায় করেছে। যদি সদাশয় সরকার সেটা বুঝে তাকে মাপ করে দেন, তাকে বাড়িছাড়া না করেন, তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবে সে। হাজার হোক, সরকারের পাখিগুলোকে তো পাহারা দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। নাকি রাখেনি?'

রেখেছেন,' স্বীকার করল ওমর। 'ঠিক আছে, বাক্সটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি থাকুন আপনার বাড়িতে। তবে সাবধান, আর কখনও ডিম চুরি করবেন না। সরকারের লোককে বলে আপনার স্বামীর চাকরিটা আপনাকে দেয়ানোর ব্যবস্থা করব, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। আর যতদিন না বেতন পাচ্ছেন, চলার জন্যে এই টাকাটা রাখুন।'

মানিব্যাগ খুলে কয়েকটা নোট গুনে নিয়ে মহিলার হাতে দিল সে।

কৃতজ্ঞতায় চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল প্যাটির। বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগল। তার স্বামী ছাড়া অন্য কোন মানুষের কাছ থেকে কোনদিন এরকম নরম ব্যবহার আর পায়নি সে।

প্যাটিকে চিন্তা করতে মানা করে, গুড-বাই জানিয়ে, বাক্সটা নিয়ে রওনা হলো ওমর আর দুই গোয়েন্দা।

কিশোরের হাতে বাক্সটা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পেয়ে তাহলে গেলাম শেষ পর্যন্ত।'

'এটাতেই আছে, তাই না?' রবিন বলল।

'হ্যাঁ।'

'খুলতে পারলে শিওর হওয়া যেত,' ওমর বলল। 'বলা যায় না, ধোঁকা দেয়ার জন্যে সাধারণ কাগজও ভরে রাখতে পারে হেস। না জেনেও একটা কথা ঠিকই অনুমান করেছে প্যাটি, এতদিন অন্য কোথাও লুকানো ছিল বাক্সটা। সেখান থেকে তুলে এনে এখানে রেখে গেছে হেস। কিংবা আসল বাক্সটা আগের জায়গাতেই আছে, নকল একটা বাক্স রেখে গেছে ধোঁকা দেয়ার জন্যে।'

'কাকে?' প্রশ্ন করল রবিন।

জবাব দিতে পারল না ওমর।

'খুললেই বোঝা যাবে আসল না নকল। কিন্তু খুলব কি দিয়ে এটা?' চিন্তা করছে কিশোর। 'কুড়াল দিয়ে কুপিয়েও তো...'

হালকা বাতাসে ভর করে ভেসে এল এঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন। ওপর দিকে মুখ তুলল ওমর। 'মুসা! একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির হয়েছে।'

নিচু দিয়ে উড়ছে বিমানটা। উড়ে গেল খাঁড়ির দিকে।

গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।

আধমাইল দূরে রয়েছে তখনও, এই সময় খাঁড়ির দিক থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।

'ডুগানরা দেখে ফেলেছে!' ছুটতে শুরু করল ওমর। বাক্সটা নিয়ে কিশোরের দৌড়াতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বলল, 'তুমি ওটা নিয়ে এখানেই থাকো। বাক্সটা পাহারা দাও। আমরা গিয়ে প্লেনটা বাঁচানোর চেষ্টা করি।'

রবিনকে নিয়ে চলে গেল ওমর।

দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। পরিস্থিতির এই হঠাৎ পরিবর্তন আশা করেনি। বাক্সটার দিকে তাকাল। ডুগানরা কোন কারণে এদিকে এলে দেখে ফেলবে ওকে। সোজা এসে বাক্সটা কেড়ে নেবে। সবার বিরুদ্ধে সে একা কিছু করতে পারবে না। লুকিয়ে ফেলতে হবে কোথাও। চারপাশে তাকাতে শুরু করল।

কোথায় লুকাবে? কোনখানে?

কোন জায়গা চোখে পড়ল না। বাক্সটা বয়ে নিয়ে এল কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট একটা গর্তের কাছে। তাতে বাক্স রেখে তার ওপর ঘাস, ঝোপের শুকনো ডাল, মরা পাতা আর মাটির ঢেলা দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। পুরোপুরি ঢাকতে পারল না। তবে যে রকম করে রেখেছে, কারও জানা না থাকলে সহজে দেখতে পাবে না।

কান খাড়া রেখেছে খাঁড়ির দিকে, শব্দ শোনার জন্যে। যা শুনেছে, তাতে উত্তেজনা বেড়েছে তার। আরও গুলির শব্দ। তারপর আবার চালু হলো বিমানের এঞ্জিন। উড়ে পালানোর চেষ্টা করছে ওটা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনছে সে। কমে এল এঞ্জিনের গুঞ্জন। তারপর বেড়ে গেল আবার। যেন ফিরে আসছে বিমানটা। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। একবারের জন্যেও চোখে পড়ল না বিমানটাকে। কি ঘটছে? কি করছে মুসা?

বহুক্ষণ কান পেতে থেকেও আর কোন শব্দ কানে এল না। নীরব হয়ে গেছে সবকিছু।

গর্তের কিনারে বসে পড়ল সে। খাঁড়িতে কি ঘটছে বোঝার উপায় নেই। খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ওমররা ফিরল না। কি করছে ওরা?

বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেল কিশোর। শেষে বাক্সটা তুলে আনল আবার গর্ত থেকে। ভেতরে কি আছে দেখা দরকার।

ছুরি ঢুকিয়ে কাটা জায়গাটা বড় করার চেষ্টা করল। দুই মাথা লম্বা করতে পারল না, তবে পেটের কাছটা ফাঁক হলো আরও। ভেতরে কাগজই আছে। ছুরির মাথা দিয়ে নাগাল পেল না ওটার। একটা সরু ডাল কেটে নিল। মাথার কাছে বাঁকা হয়ে আছে কাঁটা। ওটা ঢুকিয়ে কাগজটাকে ধরার চেষ্টা চালাল। কয়েকবারের চেষ্টায় আটকাতে পারল একটা কোনায়। টেনে বের করে আনতে লাগল। সামান্য বেরিয়ে আটকে গেল কাগজটা। তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে টানতে শুরু করল। জোরে টান দিলেও বিপদ। বাক্সের কাটা জায়গাটার দুটো পাশই ধার হয়ে আছে। কাগজ কেটে দেয়।

বেশি টানাটানি করতে গিয়ে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলার ঝুঁকি নিল না সে। যেটুকু বের করেছে তাতে কি আছে দেখল। মোটা কাগজ। একপাশে সাদা, অন্যপাশে নীল। নীল অংশে সাদা পেন্সিল দিয়ে রেখা টানা। ড্রইং। কিনারে লেখা অক্ষরগুলো জার্মান ভাষায়। আসল জিনিসটাই পেয়েছে। সন্দেহ নেই। কাগজের কোণাটা ঠেলে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল ওমরদের ফেরার অপেক্ষায়।

ক্যাকটাসের ছায়ায় বসেছে। গড়িয়ে কাটছে সময়। আরও আধঘণ্টা পেরোল। বাতাস বন্ধ। আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। নীল গায়ে হলুদ ডোরাকাটা একটা গিরগিটি গর্ত থেকে বেরিয়ে অসাবধানী একটা মাছির দিকে তাকিয়ে জিভ চাটছে। লাল-সবুজে মেশানো একটা হামিং বার্ড বড় মৌমাছির মত গুঞ্জন তুলে ক্যাকটাস ফুলের মধু খাচ্ছে। কিন্তু আপাতত নেচারাল হিস্টরি নিয়ে মাথা

ঘামানোর মত মানসিকতা নেই কিশোরের।

মট করে ছোট একটা ডাল ভাঙল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। ওমররা ফিরেছে। ঘুরে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেল। সৈকতের দিক থেকে একজন মানুষ আসছে, তবে ওমর নয়, ফ্রিক সায়ানাইড। নিশ্চয় ওদেরকে খুঁজতেই এসেছে। তারমানে ওমর আর রবিনকে যেতে দেখেনি। যাই হোক, কোনমতেই লোকটার চোখে পড়া চলবে না।

আস্তে করে গর্তে নেমে পড়ল কিশোর। মাথা নুইয়ে ফেলল। কিন্তু পুরো লুকাতে পারল না শরীরটা।

কি কারণে কে জানে ফিরে তাকাল ফ্রিক, দেখে ফেলল ওকে। চোখের পলকে ঘুরে গেল সে। একদৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা ঝোপের আড়ালে। পরক্ষণে গর্জে উঠল পিস্তল। কিশোরের কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে চলে গেল বুলেট।

ঝোপটা সই করে গুলি করল কিশোর। এভাবে আন্দাজে গুলি চালিয়ে লাভ নেই, লাগাতে পারবে না। তবু জবাব না দিলে সাহস বেড়ে যাবে ফ্রিকের। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো কিশোরের। আরেকটা গুলি এসে বিঁধল ক্যাকটাস গাছে। মাথার ওপর থেকে রসাল, মোটা ক্যাকটাস পাতা ঝরাল।

অনুমানে আর গুলি চালানোর ইচ্ছে নেই কিশোরের। ঝোপের দিকে তাকিয়ে লোকটাকে দেখার অপেক্ষায় রইল। খুব কাছেই আরেকটা ঝোপ নড়ে উঠল সামান্য। আগেরটার কাছ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সরে চলে এসেছে ফ্রিক। যেখানে নড়েছে, ঠিক সেই জায়গাটা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কিশোর।

কিছুই ঘটল না। গর্জে উঠল না পিস্তল। গুলি বেরোল না।

আরও জোরে ট্রিগারে টান দিল সে। কোনই লাভ হলো না। মুহূর্তে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল ওর। অবশ হয়ে এল হাত। জ্যাম হয়ে গেছে পিস্তলের মেকানিজম!

দ্রুতহাতে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোনমতেই খুলতে পারল না ম্যাগাজিন। কার্ট্রিজ যেখানে ছিল, সেখানেই আটকে বসে রইল। কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না। মোছার পরও সামান্য তেল লেগে ছিল। তাতে বালি লেগে জ্যাম করে দিয়েছে।

টাশ্‌শ্‌ করে শব্দ হলো আবার। ছুটে এল গুলি। এবারেও জবাব দিতে না পারলে ফ্রিক বুঝে যাবে কিশোরের পিস্তলে কোন গণ্ডগোল হয়েছে। কিংবা গুলি ফুরিয়ে গেছে। পিস্তল যে জ্যাম হয়ে গেছে, কোনমতে সেটা টের পেয়ে গেলে আর রক্ষা নেই। লাফ দিয়ে উঠে ছুটে আসবে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে। ওর মারাত্মক ক্ষুরটার কথা কল্পনা করে শিউরে উঠল কিশোর।

ঝোপের নড়া দেখে বোঝা গেল আরও এগিয়ে এসেছে ফ্রিক। কিশোরকে ভালমত নিশানায় পেতে চাইছে।

ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর, 'খবরদার, ফ্রিক, আর এক পা এগোলেই গুলি করব!'

কিন্তু ততক্ষণে ওর দুর্বলতা টের পেয়ে গেছে ফ্রিক। ঝোপ থেকে বেরিয়ে

ছুটে আসতে লাগল।

আর কোন উপায় না দেখে কিশোরও উঠে দাঁড়াল। পিস্তলটা ছুঁড়ে মারল ফ্রিকের মুখ সই করে। সরতে গিয়ে শেকড়ে পা বেধে আছড়ে পড়ল মাটিতে। পাথরে মাথা ঠুকে গেল। জ্ঞান হারানোর আগে একটা গুলির শব্দ কানে এল। ভারী একটা দেহের চাপ অনুভব করল শরীরের ওপর। তারপর সব অন্ধকার।

বারো

কিশোরকে রেখে বিমানের শব্দ লক্ষ্য করে দৌড় দিল ওমর আর রবিন। খাঁড়ির দিকে ছুটছে। দেখতে পেল ডুগান, ব্রোমানভ আর ফ্রিক দৌড়ে ঢুকে যাচ্ছে গরান গাছের জঙ্গলে। শেষ মুহূর্তে কি ভেবে ফিরে তাকাল ব্রোমানভ। ওদের দুজনকে দেখে পিস্তল তুলে গুলি করল কয়েকবার। কিন্তু দূর অনেক বেশি। ধারেকাছেও পৌঁছল না গুলি।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না ওমর। তার লক্ষ বিমানটার দিকেই বেশি। নেমেছিল, বোঝা যায়। তারপর আবার উঠে সাগরের দিকে চলে যাচ্ছে।

কি ঘটেছিল, অনুমান করতে কষ্ট হলো না। উপসাগর দিয়ে ইয়টে ফিরছিল ডুগানরা। খাঁড়ির কাছে পৌঁছতেই বিমানটাও এসে হাজির হলো। বুঝে ফেলল ওরা, কাদের বিমান। ঘাপটি মেরে রইল। যেই মুসা নামল, গুলি শুরু করল। উপায় না দেখে আবার উড়তে বাধ্য হলো মুসা।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ফেলল ওমর। চোখের পাতা সরু করে তাকিয়ে রইল বিমানটার দিকে। এমন করছে কেন? অদ্ভুত আচরণ। আহত প্রাণীর মত অস্থির। একবার নামছে, একবার ওপরে উঠছে, কাত হচ্ছে, সোজা হচ্ছে। ঠিকমত কন্ট্রোল করতে পারছে না নাকি মুসা?

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বুঝে ফেলল কারণটা ওমর। জখম হয়েছে মুসা। গুলি লেগেছে। অন্য কোন কারণই নেই আর।

লম্বা চক্কর দিয়ে খোলা সাগরের দিক থেকে তীরের দিকে নাক ঘোরাল বিমান।

'ফিরে আসছে,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রবিনের মুখ। বিমানের অস্বাভাবিক আচরণের কারণ ধরতে পারেনি সে।

জবাব না দিয়ে উঁচু জায়গার দিকে দৌড় দিল ওমর। বালির একটা উঁচু ঢিবি। এখান থেকে আকাশ তো বটেই, দুদিকে ছড়িয়ে থাকা উপকূলটাও পুরোপুরি চোখে পড়ে।

রবিনও এসে দাঁড়াল ওমরের পাশে, 'ও নামছে।'

এঞ্জিনের গুঞ্জন কমে যাচ্ছে। নাক নিচু করে ফেলেছে অটার। আবার দীর্ঘ একটা চক্কর দিয়ে উড়ে চলল দুই মাইল দূরের সৈকতের দিকে।

'সৈকতে নামবে নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'কি জানি! ল্যাগুনেও নামতে পারে,' এতক্ষণে কথা বলল চিন্তিত ওমর।

'দেখো, প্লেনটাকে যেভাবে চালাচ্ছে, আমার ভাল লাগছে না। এসো।'

বলে দৌড়ে ঢিবি থেকে নেমে বিমানের পেছনে দৌড় দিল সে। তার পেছনে রবিন।

প্রথমে সৈকতের বালিতে ঢাকা এক চিলতে জমিতে নামার চেষ্টা করল মুসা। চাকা খুলে গেছে, দেখা যাচ্ছে এখান থেকেও। জায়গাটা ল্যাগুন থেকে দূরে নয়।

'ল্যাগুনে পানি যেখানে বেশি, সেখানে নামলে ভাল করত,' ছুটতে ছুটতে বলল ওমর। 'জানেই না বোধহয়। নাকি ঝুঁকি নিল না কে জানে।'

জানালা দিয়ে মুসার মাথা না দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিন বলল, 'মুসা কোথায়?'

'ব্যাপারটা আমারও ভাল লাগছে না। ওর কিছু হয়েছে, একদম শিওর। নইলে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে আসত এতক্ষণে।'

তাড়াতাড়ি বিমানটার কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করল ওরা। কিন্তু পা দেবে যাওয়া নরম বালি, ধারাল প্রবাল, তিন ইঞ্চি লম্বা ক্যাকটাসের কাঁটা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করতে লাগল ওদের। আপ্রাণ চেষ্টা করেও এক ঘণ্টার আগে কোনমতেই পৌঁছুতে পারল না।

সৈকতের পাশে সামান্য দূর দিয়ে চলে গেছে প্রবাল প্রাচীর। খারাপ আবহাওয়ায় ফুঁসে ওঠে ভেতরের পানি, কিন্তু অন্য সময় থাকে শান্ত, স্থির। এখন আবহাওয়া ভাল, পরিষ্কার পানিকে লাগছে মসৃণ নীল কাঁচের মত। সৈকতের ডানপাশে বালির একটা উঁচু ঢিবি আড়াল করে রেখেছে ল্যাগুনটাকে।

ককপিটে পাওয়া গেল মুসাকে। মুখের দিকে একপলক তাকিয়েই বুঝে গেল ওমর, ওর সন্দেহ ঠিক।

ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে ওদের স্বাগত জানাল মুসা।

'গুলিটা কোথায় লেগেছে?' কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি জানতে চাইল ওমর।

'উরুতে। অত খারাপ নয়। আমার ভয় লাগছে, পেট্রোল ট্যাংক ফুটো করে দিয়েছে বোধহয় ওরা। তেলের ট্যাংকটাও ফুটো হয়ে থাকতে পারে। তেল বেরোনোর গন্ধ পাচ্ছি।'

ফার্স্ট এইড কিট বের করে আনল ওমর। 'চুপ করে বসে থাকো, আগে তোমার ফুটোটার একটা ব্যবস্থা করি। তারপর অন্য ফুটো মেরামত করব।...রবিন, আবার দৌড়াতে হবে তোমাকে। কিশোরকে গিয়ে নিয়ে এসো, বাক্সটা সহ। তোমরা এলেই রওনা হব।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার, 'খাইছে! ফর্মূলাটা পেয়েছেন নাকি?'

'মনে হয়।'

'দারুণ। যাক আমাদের মিশন সফল...'

'চুপ করে থাকো। বেশি কথা বললে দুর্বল হয়ে যাবে।' রবিনের দিকে ফিরল ওমর, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও। যত তাড়াতাড়ি আসবে, তত তাড়াতাড়ি রওনা হতে পারব আমরা।'

বিমান থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল রবিন। সাংঘাতিক খারাপ রাস্তা দিয়ে এই ভয়াবহ গরমের মধ্যে আবার যাওয়া এবং আসার কথা ভাবতেই দমে গেল সে। কিন্তু উপায় নেই।

শত বাধা ডিঙিয়ে, ঘামে নেয়ে, কিশোরকে যেখানে রেখে গিয়েছিল তার কাছাকাছি সবে পৌঁছেছে, এই সময় কানে এল গুলির শব্দ। থমকে দাঁড়াল সে। এর একটাই মানে। বিপদে পড়েছে কিশোর।

সাবধান হলো রবিন। চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে এগিয়ে চলল আবার। আরও গুলির শব্দ কানে এল। ঘন ঝোপের একটা দেয়ালের অন্যপাশে বেরিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল।

দশ গজ দূরে মাটিতে পড়ে আছে কিশোর। প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্রিক। হাতের পিস্তলটা তাক করে ধরেছে কিশোরের দিকে।

চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। পিস্তল তুলে গুলি করল রবিন।

গুলির আঘাতে কেঁপে উঠল ফ্রিক। ফিরে তাকাল। অবাক হয়ে গেল রবিনকে দেখে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল কিশোরের ওপর।

দৌড়ে এল রবিন। কিশোরের গায়ের ওপর থেকে টেনে সরাল ফ্রিককে।

হুঁশ ফিরেছে কিশোরের। কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কোনমতে বলল, 'এক্কে-বারে···সময় মত এসেছ!' চোখ পড়ল ফ্রিকের ওপর। 'মেরে ফেলেছ নাকি?'

মরেনি ফ্রিক। কোমরের হাড় ঘেঁষে লেগেছে গুলি। প্রচণ্ড আঘাতে বেহুঁশ হয়ে গেছে। তবে মরবে না। চিরজীবনের জন্যে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে অবশ্য। যায় যাক, আফসোস করল না কিশোর। ওর মত বদলোকের অচল হয়ে থাকাই ভাল। শয়তানি বন্ধ হবে।

'মুসার কি অবস্থা?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওকেও গুলি করেছে। ভাগ্য ভাল, উরুতে লেগেছে।···চলো, ওঠো, দেরি করা যাবে না।···বাক্সটা কই?'

গর্তের দিকে হাত তুলল কিশোর।

তেরো

বাক্সটা নিয়ে ফিরে চলল দুজনে। পথ এখন রবিনের মুখস্থ। তাই বাধাগুলোকে আগেরবারের মত অতটা কঠিন মনে হলো না।

হঠাৎ সাগরের দিকে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়াল কিশোর।

রোগ!

দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে আসছে তীরের দিকে। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক। ডুগান, ব্রোমার, আর সেই নিগ্রোটা। শ্বেতাঙ্গ নাবিককে দেখা গেল না। নিশ্চয় ইয়ট চালানোয় ব্যস্ত। ব্রোমারের হাতে টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো একটা রাইফেল।

'যাকেই চোখে পড়বে, নির্দ্বিধায় গুলি করবে সে এখন,' কিশোর বলল। 'দৌড় দাও। গুলি শুরু করার আগেই পালাতে হবে।'

ভারী বাক্সটার দুদিক থেকে দুজনে ধরে দৌড়াতে শুরু করল।

'ডিঙি নামাচ্ছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবিন। 'দেখে ফেলল নাকি আমাদের?'

এত জোরে দৌড়াচ্ছে, স্বাভাবিক অবস্থায় হলে যেটা অসম্ভব ছিল। বাক্সটা হয়েছে এক বিরাট সমস্যা। দুজনে মিলে বইছে, তারপরেও মনে হচ্ছে কয়েক মন ভারী। হ্যান্ডেল নেই। ধরে রাখতেও অসুবিধে। কয়েকবার হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল। ক্যাকটাসের কাঁটায় শরীরের চামড়া ছিড়ল অসংখ্য জায়গায়, ধারাল প্রবালে হোঁচট খেয়ে পড়ে হাতের তালু কাটল, হাঁটুতে ব্যথা পেল, কিন্তু থামল না। কোন বাধাই দমাতে পারল না ওদের। একমাত্র চিন্তা, প্লেনের কাছে পৌছানো।

কিন্তু এত কষ্ট করেও মনে হচ্ছে শেষমেষ পরাস্তই হতে হবে। দাঁড় বাইছে ডুগান আর নিগ্রো লোকটা। রাইফেল হাতে বসে আছে ব্রোমার। শত্রুকে দেখামাত্র গুলি করবে।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল নিগ্রো লোকটা। ফিরে তাকাল ব্রোমার। দেখে ফেলেছে কিশোরদের।

মুহূর্তে ঘুরে গেল ডিঙির মুখ। এগিয়ে আসতে শুরু করল এদিকে। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে গেল কিশোর। প্লেনে পৌছতে বাধা দেবে।

গুলি করল ব্রোমার। রবিন বা কিশোর দুজনের কারও গায়েই লাগল না। বেশ খানিকটা দূরে প্রবালের চিলতে উড়াল বুলেট। রেঞ্জ খুব বেশি। চলন্ত জলযান থেকে ছুটন্ত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা খুব কঠিন।

তবে ঘাবড়ে গেল কিশোর। প্লেনটা এখনও প্রায় এক মাইল দূরে। আর সৈকতের পানির কিনার থেকে ডিঙিটা মাত্র দুশো গজ। কিছুই করার নেই ওদের। পৌছতে পারবে না প্লেনের কাছে।

'ওমরভাই কি করছে? দেখছে না নাকি?'

যেন কিশোরের প্রশ্নের জবাব দিয়েই চালু হলো অটারের এঞ্জিন।

'আমাদের নিতে আসছে নাকি?' রবিনের প্রশ্ন।

'বুঝতে পারছি না। এখানে নামবে কোথায়?'

গুলির শব্দ হলো। ঝট করে বসে পড়ল দুজনে।

কিন্তু ওদের গুলি করেনি ব্রোমার। ওমরকে ঠেকাতে চাইছে।

চলতে শুরু করল অটার। লেজ উঁচু হয়ে গেছে।

'প্লেনটাকে থামাতে না পারলে আমাদের পেছনে লাগবে ব্রোমার,' কিশোর বলল। 'বাক্স নিয়ে কিছুতেই যেতে দেবে না।'

হাত থেকে বাক্সটা ছেড়ে দিল রবিন। কাত হয়ে ধপ করে পড়ল ওটা বালিতে। বিড়বিড় করে বলল, 'নাহ্, আর কোন আশা নেই!'

পাথরের একটা চাঙড় দেখিয়ে বলল কিশোর, 'জাহান্নামে যাক ফর্মূলা, জান বাঁচানো ফরজ। চলো, ওখানে লুকিয়ে পড়ি।'

চাঙড়টার আড়ালে বসে পড়ল ওরা। ইয়ট কিংবা ডিঙি থেকে গুলি করে আর ওদের গায়ে লাগাতে পারবে না। বসে বসে দেখতে লাগল, কে কি করে। মাটি থেকে চাকা তুলে ফেলেছে অটার। মরিয়া হয়ে গুলি করে চলেছে ব্রোমার।

ঠেকাতে পারল না ওমরকে।

আকাশে উঠে পড়ল বিমান। কিশোরদের দিকে উড়ে আসছে। একেবারে নিচু দিয়ে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। কাছেই পড়ল কি যেন।

দৌড়ে গিয়ে তুলে নিল কিশোর। এক টুকরো কাগজে মেসেজ লিখে ফার্স্ট এইডের খালি বাক্সে ভরে ফেলে দিয়েছে ওমর। লিখেছে: ল্যাগুনের পানিতে ফেলে দাও বাক্সটা। ওরা যেন না দেখে। তারপর চলে এসো ল্যাগুনের গভীর পানির দিকে।

টিলা আর প্রবাল প্রাচীরের জন্যে ল্যাগুনটা দেখতে পাবে না শত্রুরা। ইয়ট, ডিঙি, কোনখান থেকেই না। হামাগুড়ি দিয়ে চাঙড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। বাক্সের কাছে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে টেনে আনল কাছে। চাঙড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে রবিন। বাক্সটা ওর দিকে ঠেলে দিল কিশোর। নিয়ে আবার চাঙড়ের অন্যপাশে চলে গেল রবিন। এভাবে শুয়ে শুয়ে কাজটা করাতে শত্রুরা ওদের দেখতে পেল না। পেলে নিশ্চয় গুলি করত।

বাক্সটা বয়ে নিয়ে ছুটল আবার দুজনে। টিলার আড়ালে থাকায় দেখতে পেল না শত্রুরা।

ল্যাগুনটাকে যেখানে ঘিরে রেখেছে প্রবাল প্রাচীর, সেখানকার গভীর পানিতে বাক্সটা ফেলে দিল কিশোর। কয়েক সেকেন্ড ভেসে রইল ওটা। ভুরভুর করে বুদ্বুদ তুলে ভেতরে পানি ঢুকতে লাগল। মনে মনে প্যাটি মেহারকে ধন্যবাদ দিল সে। কেটে না রাখলে এখন পানি ঢুকত না, সহজে ডুবতও না বাক্সটা।

দ্রুত ডুবছে, তারপরেও মনে হতে লাগল যেন বড়ই ধীর। তলিয়ে গেল ওটা পানিতে। প্রাচীরের গায়ের ঢেউয়ের জন্যে পানি স্বচ্ছ হলেও নিচে কি আছে দেখার উপায় নেই। তা ছাড়া বেশ গভীর ওখানে। পানির রঙ কালচে নীল্।

সন্তুষ্ট হয়ে কিশোর বলল, 'হয়েছে। চলো।'

দৌড়াতে দৌড়াতেই কিশোর দেখল, তিনশো গজ দূরে সৈকতের বালিতে ঠেকেছে ডিঙি। নেমে পড়েছে ব্রোমার।

ক্ষণিকের জন্যে দেখা গিয়েছিল কিশোরদের, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুটে এল। সামনের ঢিবিটার আড়ালে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল দুজনে। ঢিবির আড়ালে থেকে ছুটতে লাগল। পারত পক্ষে আর বাইরে গেল না।

ল্যাগুনের গভীর অংশে, নীলচে-সবুজ পানিতে নেমে পড়েছে অটার। সেদিকে ছুটল দুজনে। কিন্তু কিছুতেই যেন পথ ফুরাতে চাইছে না। ককপিটে দেখা যাচ্ছে ওমরকে। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি করার জন্যে হাত নাড়ছে ওদের দিকে তাকিয়ে।

প্রেনের শব্দে উড়তে শুরু করেছে পাখিগুলো।

ছুটতে ছুটতেই দেখল ওরা, জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল ওমরের পিস্তলধরা একটা হাত। শূন্যে ফাঁকা গুলি করে আরও ভড়কে দিল পাখিগুলোকে। তীক্ষ্ণ ডাক ছেড়ে উড়তে লাগল ওগুলো। ডানা ঝাপটানোর শব্দ তুলে ক্রমেই উঠে যেতে লাগল ওপরে, আরও ওপরে। লাল চাদর তৈরি করছে।

পাখিগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে শত্রুর দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে ওমর। বিমানটার দিকে যাতে সময়মত চোখ না পড়ে।

পাথরে হোঁচট খেল কিশোর। হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, দেখা গেল তার হাতে একটা ডিম। হাসিমুখে বলল, 'ডেভনের জন্যে।' এত উত্তেজনার মাঝেও ভোলেনি।

পানিতে মৃদু দুলছে অটার। এঞ্জিন চলছে।

পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল কিশোর আর রবিন। সাঁতরে এগোল। দরজা খুলে দাঁড়াল ওমর। ওরা কাছে পৌঁছতেই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলে নিল।

কেবিনের মেঝেতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল কিশোর। পানি গড়াচ্ছে। কেয়ারই করল না। ডিমটা দেখতে দেখতে বলল, 'যাক, ভদ্রলোককে দেয়া কথাটা রাখতে পারব মনে হচ্ছে।'

রবিনও শুয়ে পড়েছে। কাশতে শুরু করল। গলা দিয়ে বেরিয়ে এল পেটে ঢুকে যাওয়া নোনা পানি।

এসব দেখার সময় নেই ওমরের। ককপিটে গিয়ে বসেছে সে। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্ল্যামিঙ্গোর লাল চাদর ভেদ করে ওপরে উঠে এল অটার। ডানায় লেগে দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়েও কোনমতে রক্ষা পেয়েছে।

উঠে বসল রবিন। জানালা দিয়ে তাকিয়ে বলল, 'আহা, কি দৃশ্য! এবারের কেসে অনেক সাহায্য করল আমাদেরকে ফ্ল্যামিঙ্গোগুলো।'

'ডিটেকটিভ ফ্ল্যামিঙ্গো!' দরজার কাছ থেকে বলে উঠল মুসা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেবিনে ঢুকল। 'কিন্তু মিশন সাকসেসফুল হলো না। নেয়া গেল না ফর্মূলাটা।'

'হয়েছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ডুগান ভাবতেই পারবে না ফেলে দিয়ে এসেছি ওটা আমরা। ধরে নেবে, নিয়ে গেছি। হতাশ হয়ে ফিরে যাবে দলবল সহ।'

'কিন্তু নোনা পানি ঢুকে নষ্ট হয়ে যেতে পারে কাগজ,' রবিন বলল। 'নেয়ার জন্যে ফিরে এলেও ফর্মূলা পাব না আর। পাব কতগুলো ছেঁড়া-গলা বাতিল কাগজ।'

'নষ্ট হলেই ভাল,' হাত নেড়ে আবর্জনা ঝেড়ে ফেলল যেন কিশোর, 'ওটা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে পারবে না কেউ। মানুষের কোনই উপকারে লাগবে না যে জিনিস, ক্ষতিই করবে শুধু, সেটা তুলে নেয়ার জন্যে আমার তো আর ফিরে আসারও ইচ্ছে নেই। পচুক পানির নিচে থেকে।'

◆◆◆